

কামিলের উপাখ্যান

(প্রথম আরবী বৈজ্ঞানিক-রহস্য উপন্যাস)

মূল : ইবনুল নাফিস

(আলা-আল-দ্বীন আবু আল-হাসান আলী ইবনে আবি-হাজম আল-কার্শি আল-দামেস্কি)
(১২১৩ – ১২৮৮ খ্রী)

‘রক্ত পরিসঞ্চালন বিজ্ঞানের’ জনক

এবং

আরবীয় চিকিৎসক, ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ

অনুবাদ : ডা. এন, এ, কামরুল আহসান

ভূমিকা

কামিলের উপাখ্যান

(সমকালিন অবস্থা, উপন্যাসের প্লট ও লেখক পরিচিতি)

ইসলামী স্বর্ণযুগে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির শিখরে উঠেছিল। ইসলামের ইতিহাসের ৮ম শতাব্দী থেকে ১৬তম শতাব্দী পর্যন্ত বাগদাদে এই রেনেসার শুরু (৭৮৬ থেকে ৮০৯ দস্যী), বাইতুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে, তারপর বিশ্বের বৃহত্তম শহর সমূহের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমি সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ইসলামী পন্ডিত এবং বহুবিদগণ বিশ্বের সমস্ত ও গ্রীক-রোমান সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞান সংগ্রহ ও অনুবাদ করার করার কাজ শুরু হয়েছিল আরবি ও ফারসি ভাষায়। আনুবাদকদের একটা দল গড়ে উঠেছিল। স্বর্ণযুগ জুড়ে ঐতিহাসিক উদ্ভাবন এবং অসংখ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান মানব ইতিহাসকে এক বৈপ্লবিক রূপ দিয়েছিল।

আল-জহরবী, আব্বাস ইবনে ফিরনাস, আল-বিরুনি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ইবনে আল নাফিস, ইবনে মুসা আল-খয়ারিজমি, আলহাজেন, ইবনে খালদুন এ যুগগুলিতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উল্লসিতগুলি ছিল স্বর্ণযুগের একটি বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব।

বিভিন্ন কুরআনের আদেশ ও হাদিস, যা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয় এবং জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বকে জোর দেয়, এ যুগের মুসলমানদের তাদের জ্ঞানের সন্ধান এবং বিজ্ঞানের বিকাশে প্রভাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যে পণ্ডিতদের প্রচলিতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে।

সেরা পণ্ডিত এবং উল্লেখযোগ্য অনুবাদক, যেমন হুনায়েন ইবনে ইসহাকের মত মণিষীরা রোমান-গ্রীক সাহিত্য অনুবাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

এই সময়কালে, মুসলমানরা জয়লাভ করা সভ্যতার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য দৃঢ় আগ্রহ দেখায়। প্রাচীনত্বের বহু ক্লাসিক রচনা যা অন্যথায় হারিয়ে যেতে পারে গ্রীক, ফারসি, ভারতীয়, চীনা, মিশরীয় এবং ফিনিশিয়ান সভ্যতা থেকে আরবি এবং ফার্সিতে অনুবাদ করা হয়েছিল এবং পরে তুর্কি, হিব্রু এবং লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

একের পর এক ইসলামিক বিজয়ের মাধ্যমে বিজয়ী বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক থেকে উদ্ভূত অবিস্মরণীয় বিজ্ঞানীর উদ্ভব ঘটেছিল, যারা ইসলামিক স্বর্ণযুগে বৈজ্ঞানিকভাবে সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিলেন।

এই অনুবাদ বিজ্ঞানের অন্বেষণের মধ্যদিয়ে প্রাচীন গ্রীসের দর্শনের শিক্ষাগুলি, এর প্রতিষ্ঠাতা গ্যালেন, অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) থেকে কিছু মুসলিম দার্শনিক প্রভাবিত হয়ে লিখনী শুরু করেন। এটি তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায় মারা গিয়েছিল। অনেক দার্শনিক এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন ও প্রাচীন গ্রীক-রোমান দর্শনের প্রভাবে খ্রীষ্টিয় ধর্ম দর্শনে যে বিশৃঙ্খলা জন্ম হয়েছিল, বিকাশমান ইসলামী সভ্যতাকে এ অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করে তারা লেখালেখি শুরু করেন।

মুসলিম দার্শনিক ও চিকিৎসক ইবনে সিনা (৯৮০ - ১০৩৭ খৃ) ইসলামী দর্শনের একটি বিদ্যালয়(অ্যাভিসেনিজম স্কুল) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অ্যারিস্টটলের দর্শনবিদ্যা দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ও উদ্বিগ্ন এবং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অধ্যয়ন করার পরে তিনি তাঁর জীবনকাল ধরে তাঁর দর্শনের বিকাশ করেছিলেন। ইসলামিক স্বর্ণযুগে, ইবনে সিনা এবং ইবনে রুশদ অ্যারিস্টটলের রচনাগুলিকে আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন এবং তাঁদের অধীনে ও আল-কিন্দি এবং আল-ফারাবির মতো দার্শনিকদের সাথে, অ্যারিস্টোটেলিয়ানিজম প্রাথমিক ইসলামী দর্শনের একটি প্রধান অংশে পরিণত হয়েছিল।

পরবর্তীতে এই দর্শন জ্ঞান বিজ্ঞানের সব শাখার সাথে ইসলামের চিরায়ত ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে বিভ্রাটের সৃষ্টি করে। মুসলিম দার্শনিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্ম যেমন হল তেমনি ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় বিষয় যেমন, আল্লাহ, পুণরুত্থান, শারিরিক, আত্মিক শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে মতভেদ নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপ ও দল সৃষ্টি অবিশ্যস্ত্যাবী ছিল। ইসলামী স্বর্ণযুগে মুসলিম মানসে এই আনাহত বিতর্ক বিভ্রান্তির জন্ম দিল।

পারস্যে ধর্মতত্ত্ববিদ ইমাম আল-গাজালী (১০৫৮-১১১১ খৃ) মুসলিম সাম্রাজ্যে ধর্ম-বিশ্বাসের জগতে এই বিশৃঙ্খলায় শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন এই নব্য গ্রীক দার্শনিকদের জবাব দিতে তিনি 'সত্তরটির বেশী' বই রচনা করেন। সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ রচনাগুলি মধ্যে ইহায়াহ 'উলুম আল-দীন ("ধর্মীয় তত্ত্বের পুনরুদ্ধার") উল্লেখযোগ্য। আল-গাজালি বিশ্বাস করতেন যে ইসলামিক আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যট মরণোন্মুখ হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের প্রথম প্রজন্মের শেখানো আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানগুলি ভুলে গিয়েছে।

তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে 'তাহাফুত আল-ফালাসিফা' ("تهافت الفلاسفة", দার্শনিকদের অসংলগ্নতা, *Incoherence of the Philosophers*) দর্শনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান, কারণ এটি ১৪ শতকের শেষের দিকে অ্যারিস্টোটালিয়ান তথা গ্রীক-রোমান দর্শন, বিজ্ঞানের সমালোচনার বিকাশ করেছিল।

ইবনে সিনার দর্শন বিদ্যালয়ের সমালোচনা করে, ইবনে সিনা এবং আল-ফারাবী এর মতো মুসলিম দার্শনিকদের এই গ্রন্থে নিন্দা করা হয়েছে, কারণ তারা গ্রীক দর্শন অনুসরণ করে, এমনকি, যখন এটি ইসলামের বিরোধিতা করে। বইটি নাটকীয়ভাবে সফল হয়েছিল এবং ইসলামী দর্শন এবং ধর্মতাত্ত্বিক বলয়ে মৌলিক ধর্মমতে বিশ্বাসী মুসলিম দার্শনিকদের বিজ্ঞান জগতে আরোহণের এক মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

'দার্শনিকদের বিচ্যুতি'এরিস্টটল এবং প্লেটোর দর্শনকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ইসলামী দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় চিহ্নিত করেছিল। বইটির লক্ষ্য ছিল 'ফালাসীফা' (৮ম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইসলামিক দার্শনিকদের একটি স্ব-সংজ্ঞায়িত দল) যা প্রাচীন গ্রীকদের দর্শনের দিকে আহ্বান করছিল (তাদের মধ্যে অবিসেনা এবং আল-ফারাবী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য)।

আল-গাজালী আরও বলেছিলেন যে পদার্থবিদ্যা, যুক্তি, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা গণিতের মতো দর্শনের অন্যান্য শাখায় তাঁর কোনও সমস্যা নেই। তাঁর একমাত্র কুঠার গ্রাসটি ছিল 'আধ্যাত্মবিদ্যা' (metaphysics) সাথে, যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে দার্শনিকরা এক্ষেত্রে তর্কে তারা একই সরঞ্জাম(যুক্তি) ব্যবহার করেননি, যা তারা অন্যান্য বিজ্ঞানের জন্য ব্যবহার করেছেন।

পরবর্তী শতাব্দীতে ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮খৃ) এর একটা জবাব দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী ইসলামী পণ্ডিতদের দ্বারা ভালভাবে গ্রহণ করা হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইবনে রুশদের যুক্তির তীব্র খণ্ডন করে অটোমান পন্ডিত মুস্তফা ইবনে ইউসুফ আল-বুরসোয়া লিখেছিলেন ও আল-গাজালির মতামতকে সমর্থন করে।

অন্যদিকে ইউরোপে ইবনে রুশদের লেখাগুলি সাধারণত খ্রিস্টান এবং ইহুদি পণ্ডিতদের দ্বারা ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাঁর নামে দার্শনিক স্কুল খোলা হয়েছিল।

'*Incoherence of the Philosophers*, দার্শনিকদের অসংলগ্নতা' -বই এরিস্টটল এবং প্লেটোকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ইসলামী দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় চিহ্নিত করেছিল। বইটির লক্ষ্য ছিল ৮-১১ তম থেকে একদল দার্শনিক(যাদের মধ্যে ইবনে সিনা এবং আল-ফারাবী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য), যারা প্রাচীন গ্রীকদের দর্শনের উপর লেখালেখি ও চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন।

বইটিতে বিশটি অধ্যায়ে আল-গাজালি, ইবনে সিনার মতবাদকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ইবনে সিনা এবং তার অনুসারীরা ধর্মদ্রোহ করার মাধ্যমে সতেরোটি পয়েন্টে

(যার প্রত্যেকটিই তিনি একটি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে সম্বোধন করেছেন) ভুল করেছেন। আর অন্য তিনটি অধ্যায়ে তিনি তাদেরকে একেবারে ধর্মবিরুদ্ধ বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তাদের অক্ষমতা এবং একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্বের অসম্ভবতা প্রমাণ করতে অক্ষমতা। শারীরিক পুনরুত্থান এবং তার সাথে জান্নাতের আনন্দ বা জাহান্নামের যন্ত্রণার স্বীকার না করা।

আন্দালুশিয়ার বহুবিদ্যাজ্ঞ, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও কোর্ট কর্মকর্তা আবু বকর ইবনে তোফাইল (১১০৫-১১৮৫খ্রী) ইমাম গাজ্জালির এই লেখার কটাক্ষ করে ১২শতকের প্রথম দিকে একটি প্রথম আরবী দার্শনিক উপন্যাস “حي بن يفظان” *Alive, son of Awake*, স্বশিক্ষিত দার্শনিক **Philosophus Autodidactus**) লিখেন।

গল্পটি হাই বিন ইয়াকজান নামে এক ছোট্ট ছেলে, যে ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপে বেড়ে উঠেছিল, লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একটি মৃগীর বকে, যে তাকে তার দুধ খাইয়েছিল। এই সবেমাত্র হাঁটা শিখেছে: তার চারপাশের হরিণ, পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীদের শব্দগুলির অনুকরণ করে, সে তার চারপাশের প্রাণীদের ভাষা শিখে; এবং সে প্রাণীর প্রবৃত্তি নকল করে নিজেকে ক্রিয়াকলাপে পরিচালিত করতে শিখে। সে প্রাণীর চামড়া থেকে নিজের জুতা এবং কাপড় তৈরি করে, তারাগুলি অধ্যয়ন করে, যতক্ষণ না সে সেরা জ্যোতিষবিদের জ্ঞানের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। তার ক্রমাগত অনুসন্ধান এবং প্রাণী ও পরিবেশের পর্যবেক্ষণ তাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্ম সম্পর্কে দুর্দান্ত জ্ঞান অর্জন করতে পরিচালিত করে। সে উপসংহারে পৌঁছে যায় যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টির ভিত্তিতে একজন মহান স্রষ্টার অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। ইয়ে ইবনে ইয়াজকান সুফির মতো নম্র বিনয়ী জীবনযাপন করেছিল এবং মাংস খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত করেছিল।

ত্রিশ বছর বয়সে, তিনি প্রথম মানুষের সাথে সাক্ষাত করল এবং যে তাঁর বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অবতরণ করেছিলেন। উনানল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে, সে সারাজীবন যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে অন্য লোকদের শেখাতে প্রস্তুত হল।

হাই অবশেষে সভ্যতা ও ধর্মের সংস্পর্শে আসে যখন সে আবশাল নামে এক জাহাজডুবি প্রবাসীর সাথে দেখা হল ঘটনাক্রমে। সে দর্শন এবং ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞ হলে, অন্যকে শেখাতে উন্মুখ হলে কিন্তু যখন সে তার আগন্তুক বন্ধুর সাথে লোকালয়ে উপস্থিত হল সে তার লক্ষ দর্শন জনগনকে তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে মানাতে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে আবার পূর্বের দ্বীপে ফিরে গেল।

পারস্যের বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম আল-গাজ্জালির ‘দার্শনিকদের অসংলগ্নতা’এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইবনে তুফাইলের ‘স্বশিক্ষিত দার্শনিক’ রচিত হয়েছিল।

আরবীয় সাহিত্য এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রথম আরবী উপন্যাস উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে এবং ১৭ তম এবং ১৮তম শতকে পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে সেরা বিক্রয়পণ্যে পরিণত হয়েছিল। ইসলামী দর্শন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের উভয় ক্ষেত্রেই এই কাজের “গভীর প্রভাব” ছিল। এটি হয়ে উঠল “বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের” এবং ইউরোপকে আলোকিত করার একটি

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই হিসাবে দেখা দিল এবং উপন্যাসে প্রকাশিত চিন্তাভাবনাগুলি পশ্চিমের ও ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের(Isaac Newton, and Immanuel Kant সহ)এর বইগুলিতে বিভিন্ন প্রকারে এবং বিভিন্ন ভাবে উদ্ধৃত গিয়েছিল ।

ইবনে নাফিস(১২১৩-১২৮৪ খ্রী) (আরবি: ابن النفيس **আলা আল দ্বীন আবু আল হাসান আলী**)- এই (আবু তুফাইলের) প্রথম আরবী উপন্যাসের (ইমাম আল গাজালির "দার্শনিকদের অসংলগ্নতা" প্রতিক্রিয়া ছিল)প্রতিবাদে বক্ষমান প্রথম আরবী সাইন্স ফিকশান(কল্প-বৈজ্ঞানিক উপন্যাস),**কামিলের উপাখ্যান** (الرسالة الكاملة في السيرة النبوية) *Theologus Autodidactus* ("স্বশিক্ষিত ধর্মতাত্ত্বিক"), (রচনা:১২৬৮ও ১২৭৭ খ্রী মধ্যে)।

তিনি ছিলেন একজন আরব-সিরিয়ান চিকিৎসক বহুবিদ্যাজ্ঞ যার কাজের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে মেডিসিন, সার্জারি, ফিজিওলজি, শারীরবিদ্যা, অ্যানাটমি, জীববিজ্ঞান, ইসলামী স্টাডিজ, ইসলামী আইনশাস্ত্র ,দর্শন এবং রক্ষণশীল মুসলিম দার্শনিক(সুন্নী-সাফীঈ অনুশীলনকারী মুসলিম)। তিনি বেশিরভাগই রক্তের ‘পালমোনারি রক্ত সঞ্চালন’ বর্ণনা করার জন্য খ্যাতিমান।

দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের ‘রক্ত সঞ্চালনের শারীরবৃত্তির’ বিষয়ে তাঁর এ তত্ত্ব বর্ণনা অবধি অপরিবর্তিত ছিল এবং ইবনে আল-নাফিসের রচনার জন্য তাঁকে "**রক্তসংবহন পদার্থবিদ্যার জনক**" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৭ শতকে ব্রিটিশ চিকিৎসক **William Harvey** (১৫৭৮ - ১৬৫৭) পরবর্তীতে পূর্ণ সঞ্চালনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

ফুসফুসে হৃদপিণ্ডের রক্তপরিচালনের নতুন জ্ঞান পাশাপাশি,তিনি হৃদপিণ্ডের নিজের রক্ত সরবরাহ(coronary circulation)ও শরীরের(capillary circulation) সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে প্রথম জানান।তিনি সুলতান সালাহ উদ্দীনের(১১৭৪ - ১১৯৩ খ্রী) প্রতিষ্ঠিত কায়রোর আল-নাসেরী হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ও শল্যবিদ ছিলেন। চিকিৎসা ছাড়াও তিনি শাফিঈ ফিকাহ বিশেষজ্ঞ ছিলেন।চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর তাঁর ১১০টিরও বেশী পাঠ্য বই রচনা করেছেন।কয়েকটি হাতে লিখা বইও পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে।

‘কামিলের উপাখ্যান’ বই এর প্লটটি ইবনে তুফাইলের একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যিনি প্রথম আরবি উপন্যাস ‘হাই বিন ইয়াজকান’ লিখেছিলেন, যা আল গাজালির ‘দার্শনিকদের অসংলগ্নতা’ এর প্রতিক্রিয়া ছিল। ইবনে আল-নাফিস এইভাবে ‘কামিলের উপাখ্যান’ এর বিবরণ ‘হাই ইবনে ইয়াজকান’ যুক্তির খণ্ডন হিসাবে লিখেছিলেন।

গল্পের প্লট:

গল্পটির নায়ক কামিল হল স্বতঃস্ফূর্ত বন্য শিশু যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি গুহায় উৎপন্ন এবং নির্জন দ্বীপে নির্জনতায় জীবনযাপন করেছে। অবশেষে সেই দ্বীপে জাহাজ ভেঙে আটকা পড়া সমাজচ্যুত লোকেরা আসার পরে বাইরের বিশ্বের সংস্পর্শে আসে এবং পরে তারা তাদের সাথে সভ্য বিশ্বে যায় একটা সভ্য মানব সমাজে। প্লটটি ধীরে ধীরে আগত যুগের গল্পে বিকাশ লাভ করে এবং তারপরে বিজ্ঞান কল্পকাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করে এটি একটি বিপর্যয়ী ক্রিয়ামত দিবসের সর্বনাশের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে।

বিষয়:

কামিলের গল্পের মাধ্যমে ইবনে-নাফিস প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, যে মানব মন যুক্তি ও যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় সত্যকে অনুমান করতে সক্ষম। গল্পটিতে উপস্থাপিত 'সত্য' হল এক আল্লাহর অস্তিত্ব, ইসলামের নবীদের(স) জীবন ও শিক্ষা এবং মানব প্রজাতির উৎস এবং ভবিষ্যদ্বাণী সহ অতীত, বর্তমান এবং ঐতিহাসিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশেষে প্রথম হয়ে ওঠে একটি বিজ্ঞান কথাসাহিত্য উপন্যাসের উদাহরণ। গল্পের শেষ দুটি অধ্যায় একটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে পৃথিবীর শেষ, ক্রিয়ামত, পুনরুত্থান এবং পরবর্তীকালের জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাজাগতিক ও ভূতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ কল্পনা করা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বই

এর পেছনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বর্হিবিশ্বের সভ্য মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি ও জীবনানুষ্ঠান, থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা, একটি কাল্পনিক বর্ণনা ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী ধর্মীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের শিক্ষা-উপলব্ধিগুলি ব্যাখ্যার চেষ্টা করা।

ইবনে-নাফিস বইটিকে "নবী-রাসূলগণের মিশন, ধর্মীয় আইন, দেহের পুনরুত্থান, এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব" সম্পর্কিত মুসলমানদের মতবাদের প্রতিরক্ষা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি শারীরিক পুনরুত্থান এবং মানব আত্মার অমরত্বের জন্য যৌক্তিক যুক্তি উপস্থাপন করেন। উপন্যাসটিতে তাঁর নতুন দেহবিজ্ঞান এবং ফুসফুসীয় সংকলন এবং পালসেশন সম্পর্কিত তার তত্ত্বগুলির উল্লেখও রয়েছে, যা তিনি শারীরিক পুনরুত্থানের ন্যায্যতার জন্য ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ইসলামিক পণ্ডিতরা এই কাজটি 'ইবনে সিনার আত্মিক দাবির' প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখেছিলেন, এটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা আগে ইমাম আল-গাজালী দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল এবং রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ যা গ্রহণ করে নাই।

'কামিলের উপাখ্যান' এই গল্পের কাঠামোর পেছনের উদ্দেশ্য ছিল আবু তোফাইলের (গ্রীক-রোমান দার্শনিকদের সহ) এই যুক্তিকে খণ্ডন করা যে দর্শন ও চিন্তা দ্বারা (autodidacticism) একই ধর্মীয় সত্য উদ্ঘাটন একই সত্য হতে পারে, যা প্রত্যাদেশ(ওহী) যা করে।

ইবনে আল-নাফিস বিশ্বাস করেছিলেন যে ধর্মীয় সত্যগুলি কেবল ওহি দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে, বইটিতে যার(ওহী) প্রতিনিধিত্ব করে সভ্য মানব সমাজ। এই মুসলিম সমাজ প্রত্যাদেশ(ওহী) দ্বারা

লালিত ,আর সেখানে কামিল সামাজিক বিনিময় ও কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের নবী,শেষ নবী(স),ধর্ম সব সম্পর্কে যেমন জানল তেমনি চিন্তা-বিশ্লেষণে অতীত ও ভবিষ্যতের সব অনুধাবন করে সঠিক উপলব্ধিতে পূর্ণঙ্গতা পেল।

লেখক ইবনে নাফিস ,উইলিয়াম হারভে এর ৩০০বছর আগে রক্তসঞ্চালনে তত্ত্ব বিশ্ববাসীকে জানালেও আমরা যেমন জানি এটা হারভের কাজ,তেমনি মানব জাতির জন্য মুসলিম চিকিৎসকের অবদানে আমরা ইবনে সিনা,আল-ফারাবীদের পাই,যাঁরা গ্রীকো-রোমান দর্শনেরই চর্চা করেছেন,তার বাহিরে যেতে পারেন নাই।

উপন্যাসটি রূপক , একারণে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক,সামাজিক ও দার্শনিক অবস্থা সম্পর্কে অবগতি না থাকলে কাহিনীটি সহজবোধ্য হবে না বলে ভূমিকায় এটা অবতারণা করা হল।আশা করি পাঠক মহল এই সাইন্স ফিকশান থেকে উপকৃত হবেন ,যাঁরা বিশেষত বিজ্ঞানের নামে আত্ম সম্পর্গ করেন না। যাঁরা মনে রাখেন, বিজ্ঞান মানুষেরই উদ্ভাবিত বা অর্জিত বিশেষ জ্ঞান।

উপন্যাসটি প্রকাশনায় যাঁরা সহযোগীতা করেছেন তাদের সকলকে এবং এর বাণী সম্প্রচারে সহযোগীতা করেছেন ও করবেন সবায়কে মহান আল্লাহ প্রতিদান দিন।আমিন।

অধ্যাপক ডা.এন এ কামরুল আহসান

লালমাটিয়া | ঢাকা।

২০ মে ২০২০

কামিলের উপাখ্যান

(সীরাতে রসূল স. অবলম্বনে)

মূল:

الرَّسَالَةُ الْكَامِلِيَّةُ فِي السِّيَرَةِ النَّبَوِيَّةِ

স্বশিফীত ধর্মতাত্ত্বিক

(আরবী সাহিত্যে প্রথম **science fiction**)

মূল : ইবনুল নাফিস

(আলা-আল-দ্বীন আবু আল-হাসান আলী ইবনে আবি-হাজম আল-কার্শি আল-দামেস্কি)
(১২১৩ – ১২৮৮ খ্রী)

‘রক্ত পরিসঞ্চালন বিজ্ঞানের ’ জনক

এবং

আরবী চিকিৎসক, ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও জ্যাতিবিদ

অনুবাদ : ডা. এন, এ, কামরুল আহসান

অনুবাদ

কামিল এর উপাখ্যান

আল-নাকীস

[দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলি ইবনে আবিল ইবনে হারাম আল-কুরাইশী, যিনি একজন চিকিৎসক, যিনি আল্লাহর সাহায্য নির্ভর এবং তাকে আল্লাহ ঋণমা করুন , বলছি : আল্লাহর প্রশংসার পর, মহানবী এবং রাসূলগণের সেরা মুহাম্মদ(স) এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা ও নেয়ামতের পরে (আমি বলি):

এই গ্রন্থে আমার উদ্দেশ্য হ'ল কামিল নামক ব্যক্তির কাছ থেকে ফাদিল ইবনে নাতিক নবীর(স) জীবন কাহিনী এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে, শব্দের বাহুল্য বাদ দিয়ে , অস্পষ্টতা থেকে বিরত থাকার প্রচেষ্টা এবং যতদূর সম্ভব বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করার সহ বইয়ের আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা।

আমি এটিকে চারটি ভাগে সাজিয়েছি:

প্রথম অংশ ব্যাখ্যা করে যে এই লোকটি কীভাবে কামিল নামে পরিচিত, তা কীভাবে হল এবং সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং নবীদের উদ্দেশ্য জানতে পেরেছিল;

দ্বিতীয় কীভাবে সে নবীর(স) জীবন কাহিনী জানতে পেরেছিল;

তৃতীয় কীভাবে সে ধর্মীয় আইন সম্পর্কিত অধ্যাদেশগুলি জানতে পেরেছিল;

চতুর্থ যেভাবে সে শেষ নবীর(স) মৃত্যুর পরে সংঘটিত ঘটনাগুলি জানতে পেরেছিল – তাঁর(স) ও তাদের সকলের উপর আল্লাহর রহমত হক।]

প্রথম অংশ

কামিল নামক এই ব্যক্তিটির কীভাবে জন্ম হয়েছিল এবং কীভাবে সে (প্রাকৃতিক) বিজ্ঞান এবং নবীদের(আ) মিশন জানতে পেরেছিল - তার তিনটি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : **কামিল নামক ব্যক্তিটি কীভাবে গঠিত হয়েছিল,**

গল্পকার ফাদিল ইবনে নাতিক বলল:

একটি জনশূন্য মাঝারি জলবায়ুর এবং ভেঁষজ, গাছ এবং ফলমূল সমৃদ্ধ একটি দ্বীপ। সেখানে একবার একটি বড় বন্যার ঘটনা ঘটল। এই বন্যার সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রচুর পরিমাণে কাদামাটি মিশ্রিত হয়ে দ্বীপটিতে জমা হল। বিভিন্ন ধরনের মাটির উপরে দিয়ে বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল বলে মাটিগুলি বিভিন্ন প্রকারের ছিল। বন্যার পানি একটি পাহাড়ের ঢালুতে অবস্থিত একটি গুহায় ঢুকে এটি পূর্ণ করে দিল। অবশেষে বন্যার

পানির স্রোতের টানে গুহাটির মুখে অনেক কাদামাটি এবং ভেসজ গাছ এসে এটি বন্ধ করে দেয়। তারপর এই বন্যা হ্রাস পায় কিন্তু এই গুহাটি এর সামগ্রীতে পরিপূর্ণ থাকে।

আবার যখন গ্রীষ্ম আসল, এবং গুহার ভিতরের আটকে পরা বস্তুগুলি গরম হয়ে যায় এবং উত্তপ্ত হয়ে গাঁজাইয়া উঠে; ততক্ষণে তাদের মধ্যে থাকা কাদামাটি পরিণত, সুসিক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তারা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার খুব কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত তাদের মধ্যে উৎপন্ন উতাপের কারণে সেদ্ধ হওয়া বন্ধ হল না, যতক্ষণ না তা ভালভাবে একটা মিশ্রণে পরিণত হল (মেজাজ, temperment)। মিশ্রণটি আঠাল হয়ে ওঠল এবং তা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হওয়ার উপযুক্ত হল; মিশ্রণটির বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক হল কারণ এটা বিভিন্ন মেজাজের মাটি মিশ্রণ ছিল। তারা আলাদা ছিল। এদের মধ্যে কিছু গরম এবং শুকনো মেজাজের ছিল, যা মানুষের হৃদয়ের মেজাজের মতো; অন্যরা গরম এবং আর্দ্র ছিল, মানব লিভারের মেজাজের মতো। অন্যদের মেজাজ ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক, মানুষের হাড়ের মেজাজের মতো। আবার কোন অংশ শীতল এবং আর্দ্র মেজাজের, মানুষের মস্তিষ্কের স্বভাবের মতো। অন্য অংশ মানুষের স্নায়ুর মতো মেজাজের আবার কোনটা মানুষের মাংসের স্বভাবের মত।

গুহাটির ভিতরের বহু ধরনের মাটির মিশ্রণটিতে মানুষের সব অঙ্গের মেজাজের উপযুক্ত উপাদানের মাটি ছিল এবং এর দৃঢ়তা অঙ্গগুলি তৈরি করার উপযুক্ত হল। এভাবে গুহার মিশ্রণটি মানুষের অঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল^১। আল্লাহ তা'য়ালার উদারতায় কোন ব্যক্তির প্রাপ্য ও তার অধিকার বঞ্চিত করেন না। প্রত্যেককে যার জন্য প্রস্তুত রয়েছে তার জন্য তা অনুদান দেন। তাই তিনি মাটির অংশগুলি থেকে একজন মানুষের অঙ্গসমূহ এবং পুরা মিশ্রণটি থেকে একটি মানুষের দেহ সৃষ্টি হতে লাগল। যখন এই কাদামাটি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল, সেখান থেকে বাষ্প উৎপন্ন হল। পরিশুদ্ধ ও বায়ুযুক্ত। যা মানব আত্মার (রুহ,) মেজাজের মত ছিল। এতে করে পূর্ণ একটি মানুষের সৃষ্টি হল।

^১ এই অংশটা গ্রীক দার্শনিক এবং চিকিৎসকদের ধারণাগুলি পুরোপুরি অনুসরণ করে; এগুলির সর্বাধিক বিস্তারিত গ্যালেনের ডিটেমপারমেন্ট বই দ্রষ্টব্য। এ অনুমান (বিজ্ঞান) ১৯শতক পর্যন্ত চালু ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান এটা স্বীকার করে না।

এই মানুষটি বিভিন্ন দিক থেকে মানব গর্ভে গঠিত মানুষ থেকে আলাদা হল। প্রথমত, এই লোকটির গঠনটি মুরগির ডিমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন গুহাটি ডিমের খোসার সাথে তুলনা হয়। আর ডিমের কুসুম এবং সাদা অংশ, গুহার মাটির মিশ্রণটির অনুরূপ। ডিমের যে অংশ থেকে মুরগীর বাচ্চা গঠিত হয়।

দ্বিতীয়ত, এই ব্যক্তির দেহটি খুব বড়, কারণ মাটির মিশ্রণটি যথেষ্ট মানুষটির দেহের প্রতিটি অঙ্গ গঠিত হয়েছিল তা অনেক বেশী পরিমানের ছিল। এটা শুক্রাণু কণার বিপরীত ছিল, যা থেকে মানব গর্ভে ক্রমের অঙ্গগুলি গঠন করে, সাধারণ মানুষের বেলায়।

তৃতীয়ত: যখন গুহার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তার অঙ্গগুলি প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি পেয়েছিল। আর সমানভাবে বায়ু পেয়েছিল যা তার আত্মা দিয়েছে (রুহ)^২। তার অঙ্গগুলি শক্তিশালী না হওয়া অবধি গুহায় থাকল। তার উপলব্ধি এবং তাঁর গতিবিধি জোরালো না হওয়া পর্যন্ত সে অবস্থায় গুহার কাদামাটির মধ্যেই থাকতে অসুবিধা হল না। এই কারণেই সে যখন গুহাটি ত্যাগ করল, তখন সে উপলব্ধি, গতিবিধিতে দশ বা বারো বছরের যুবকের মতো হল। কাদামাটিতে তার জন্ম, মানুষের গর্ভে যেমন মানুষের জন্ম হয় তার মত নয়, বিপরীত।

গুহা থেকে এই লোকটির বের হওয়া ডিম থেকে একটি মুরগির বাচ্চা বেরোনের অনুরূপ ছিল। আর এই বের হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল যখন সে কাদামাটিতে থাকা অবস্থায় হাত ও পা নাড়াচাড়া করা ও গুহার বাইরে

বেরোনের ইচ্ছে করল। এক সময় পরিপক্ব হয়ে গুহার প্রবেশ পথের ভরাট কিছু মাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে গিয়েছিল (ডিমের ভাঙা খোঁসার মত)। ; আর তার নড়ন চড়নে এটিতে সহজেই ছিদ্র হল। এই ছিদ্র পথে বের হওয়া অবধি তাকে জরসড় ও হামাগুড়ি দিতে থাকতে হল। ঠিক যেমন মুরগীর ডিমের খোসা বা আবরন থেকে বাচ্চা বের হওয়ার সময় ছিদ্র হয় আর সেই পথে নাড়াচাড়া করে বাচ্চা বের হয়। (গুহাতে জমা হওয়া আবর্জনা ডিমের কুসুম, সাদা অংশ আর গুহাটির দেওয়াল খোসা বা আবরন সদৃশ)। যখন বের হল তখনও সে হামাগুড়ি দিয়ে বের হল আর এ ভাবেই চলল যতক্ষণ না সে সোজা দাঁড়াতে শিখল ^১। এই গুহায় জন্ম নেওয়া মানব শিশুটি নাম কামিল।

দ্বিতীয় বিভাগ: *কামিল কীভাবে বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অর্জন করল:*

কামিল যখন গুহা থেকে বের হল, তখন লক্ষ্য করল স্থান, আলো এবং সেই দ্বীপের গাছগুলি। সে শুনল পাখির কন্ঠস্বর, সমুদ্রের গর্জন, নদীর গর্জন ও বাতাসের ধ্বনি।

^১ তৎকালীন আরব চিকিৎসকদের মতে, গ্যালেনকে অনুসরণ করে, আত্মা বায়ু এবং পরিশোধিত রক্তের মিশ্রণ থেকে তৈরি হয়।

^২ Aristotole , Neo-Platonic এর ‘ স্বতঃস্ফূর্ত প্রজন্মের’ ধারণার অনুযায়ী।

সে ফুল এবং গাছের ঘ্রাণ নিল, গাছ থেকে যে ফলগুলি পড়েছিল তা থেকে খেল, তার স্বাদ পেল এবং বাতাসের উত্তাপ ও শীত অনুভব করেছিল এবং সে এতে খুব অবাক হল।

যখন সে চোখ বন্ধ করল তখন সব দৃশ্যমান জিনিসগুলি তার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং পরে যখন সে চোখ খুলল তখন সে সেগুলি আবার দেখতে পেল।

তেমনিভাবে, যখন সে আগুল দিয়ে তার কান বন্ধ করল, শব্দ আর শুনতে পেল না এবং খুললে আবার শুনতে পারল। যখন সুস্বাদু জিনিসগুলি তাঁর মুখে দিল, তখন সে তাদের স্বাদ বুঝতে পারল এবং সেগুলি সরিয়ে নেওয়ার পরে তা আর উপলব্ধি করতে পারল না।

নাকের এবং স্বকের সংস্পর্শে আসলে, একই অভিজ্ঞতা পেল। এটি যখন বারবার ঘটল, সে বুঝল যে এই অঙ্গগুলি এই উপলব্ধিগুলির অঙ্গ এবং অঙ্গগুলির এটি কাজ।

তেমনি সে বুঝল যে তার হাতগুলি ধরার জন্য এবং তার পাদুটি হাঁটার জন্য এবং এভাবে সব সে বুঝে উঠল। এই পদ্ধতিতে সে বাহ্যিক অঙ্গগুলির বহু কার্যকারিতা সম্পর্কে পরিচিত হল এবং তার পেটের অভ্যন্তরের এবং বক্ষস্থলের অঙ্গগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা হল।

সে দেখল যে সে অন্যদের মধ্যেও এটি পর্যবেক্ষণ করতে পারে; সুতরাং সে যে প্রাণীদের ধরতে পারত এবং যা মৃত অবস্থায় পেত, তার পেট খুলতে শুরু করল। সে তাঁর নখ, ধারালো পাথর, নলবনের স্পিন্ডার এবং এই জাতীয় জিনিস যা পেত তা দিয়ে এটি করা শুরু করল। এইভাবে সে পেট পর্যবেক্ষণ করল এবং তাতে প্রবেশ করে খাদ্য পরিপাক হয়। দেখল মুখ থেকে আসা একটা নলের মাধ্যমে খাদ্য পেটে প্রবেশ করে। অল্প পেটের দীর্ঘতম অংশ যা পাকস্থলির শেষ প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং শেষে মলদ্বারের সাথে সংযুক্ত থাকায় খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ অল্প থেকে মলদ্বার দিয়ে বের হয়। সে দেখল যে খাবারের মূল অংশগুলি পেট এবং অল্পের সাথে সংযুক্ত থাকা রক্তের নালীর মধ্যে প্রবেশ করে। পরে যকৃতের মধ্যে প্রবেশ করে মিশ্রণে পরিণত হয় (মেজাজ), যা পরে লিভারের সাথে সংশ্লিষ্ট রক্তনালীতে প্রবেশ করে, এবং এই নালীর শাখাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পরে, যতক্ষণ না এই শাখাগুলির ছিদ্রগুলি থেকে অন্য অঙ্গগুলিতে নির্গত হয়। এভাবে সে এই অঙ্গগুলির কার্যকারিতা জানতে পারল।

এরপর, কামিল বক্ষের মধ্যে হৃদযন্ত্র লক্ষ্য করল। দেখল এটার ডান অলিন্দ(ventricle)রক্তে পূর্ণ, বাম অলিন্দ পূর্ণ মেজাজ (spirit, আত্মা) দিয়ে। আর এ অলিন্দ সংকোচন করলে এই স্পিরিট (আত্মা) ধমনী দিয়ে অন্য অঙ্গে প্রবেশ করে। তারপর হৃদযন্ত্র আবার প্রসারিত হয়, যাতে আত্মা আবার ফিরে আসে। একই সময়ে বায়ু ফুসফুসে বাহিরের বাতাস থেকে নাক, মুখ, স্বরযন্ত্র ও বাতাসের পাইপ দিয়ে প্রবেশ করে। এটা ঘটে যখন ফুসফুস প্রসারিত হয় ^৩। ফুসফুসের ফাঁকা জায়গায় বাতাস ঢুকে পড়ে। আবার যখন ফুসফুস সংকুচিত হয় বাতাসের গরম কিছু অংশ তা বের হয়ে যায়।

৩। এটা তৎকালীন গ্রীক-রোমান দর্শনের ধারণা তত্ত্ব। ইবনে নাফিস তার রক্তচলাচল তত্ত্ব এখানে বর্ণনা করেন নাই। সম্ভবত এ উপন্যাসের পর এটা আবিষ্কার করেছিলেন।

ফুসফুসের সংকোচন এবং প্রসারিত হওয়ার ব্যাপারটা হয় ‘ডায়াক্রাম’ নামক ছাতার মত মাংশ পেশী ও বক্ষের মাংশ পেশী সংকোচন-প্রসারণ হওয়ার ফলে। এগুলি প্রসারণ-সংকোচনের ফলে ঘটে বক্ষের সংকোচন ও প্রসারণও হয়। এবং এইভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস এবং কণ্ঠস্বর বের হয়। এভাবে নিজের অনুসন্ধান কামিল জানল যে এই জিনিসগুলি এই অঙ্গগুলির কাজ। সে এনাটমি বা গঠন বিজ্ঞানের একটি বড় অংশের সাথে পরিচিত না হওয়া অবধি ক্রমাগত প্রতিটি অঙ্গে অনুসন্ধান করতে লাগল। এছাড়াও সে প্রাণীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করল এবং দেখল যে তাদের মধ্যে কিছু সিংহ, চিতাবাঘ ও নেকড়ের মতো সাহসী, আক্রমণাত্মক এবং মাংশাশী। অন্যরা ভীতু এবং যারা তাদের গ্রাস করে বা ধরার চেষ্টা করে তাদের কাছ থেকে উড়ে যায়, কেউ পালিয়ে যায়। এভাবে সে পর্যবেক্ষণ করতে থাকল, যতক্ষণ না প্রাণীদের অবস্থা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

এরপরে সে গাছপালা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করল এবং পর্যবেক্ষণ করল যে কীভাবে উদ্ভিদ বীজ থেকে বৃদ্ধি পায়। সে দেখল, কি ভাবে মাটি থেকে জলীয় পদার্থের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে বীজগুলি ফুলে যায়, এটি কি ভাবে কুঁচির বিভাজনকে প্রভাবিত করে। কিভাবে বীজ থেকে একটি পাতার মত অঙ্কুর বের হয়ে মাটি থেকে পদার্থকে সফলভাবে চুষে ফেলে। কামিল পর্যবেক্ষণ করল উদ্ভিদের উদ্ভঙ্গ হওয়া, বড় হওয়া, লম্বা হয় এবং মাটি থেকে উদ্ভিত হওয়া।

সে গাছের পাতাগুলিও পর্যবেক্ষণ করে দেখল, যে পাতার গোড়া থেকে তার ডগা পর্যন্ত একটি অক্ষের মতো জিনিস প্রসারিত হয়েছে। তা থেকে সুতার মত উভয় প্রান্তে প্রসারিত হয়, যার মাধ্যমে পুষ্টি পাতার সমস্ত অংশে প্রবেশ করে। তা দ্বারা পাতাগুলি বড় হয়। সে ফলগুলি পর্যবেক্ষণ করে দেখল যে, এর মধ্যে কিছু প্রকাশ্যভাবে দেখা যায়, যেমন ডুমুর, অন্যেরা তুষের মত আচ্ছাদনের মধ্যে থাকে, যেমন শিম। আবার কিছু খালের মতো, যেমন ওক ফল, কোনটি ঝিল্লির মত, যেমন গমের দানা এবং কিছু একাধিক আচ্ছাদন দিয়ে মোড়া, যেমন নাট, বাদাম। তদুপরি সে দেখল কিছু ফলের একটি বীজ থাকে, যেমন এপ্রিকট, খুবানি ফল এবং বাদাম। কিছু বহু বীচ ওয়ালা যেমন ডালিম এবং কুমড়ো। আবার কয়েকটি ফল একক, যেমন জামির এবং বাদাম। কিছু আবার গুচ্ছাকারের থাকে যেমন আঙ্গুরের গুচ্ছ। সে দ্রাক্ষালতা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেল যে একক আঙ্গুরের বীজ দুটি এবং একইভাবে সমস্ত ফলের বীজও।

সে বুঝতে পারল, দুটি অংশের একটির দুর্ঘটনা ঘটলে অপর অংশ প্রজন্ম তৈরীর কাজ সম্পাদন করতে পারে। আরও সে দেখল যে প্রতিটি আঙ্গুরের এবং এমনকি প্রতিটি ফলের উপর একটি চামড়া আছে যা ফলের ভীতরের জিনিস সংরক্ষণ করে। আঙ্গুরের মজার নালীগুলি গোড়া থেকে পুষ্টি সরবরাহ করে, এই নালীগুলির মাঝখানে অংশগুলি সরস। উদ্দেশ্য বীজের শাঁসে পুষ্টি সরবরাহ করা। সে বুঝলে পারল যে প্রাণী এবং গাছপালা সব অঙ্গেরই কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং ব্যবহার আছে, এবং তাদের কিছুই অতিরিক্ত এবং প্রয়োজনহীন নয়।^৪

^৪ এটি এরীসটোটল, গ্যালেনের বিশ্ব জগতের ও চিকিৎসার ‘পরম কারণ মূলক’ ধারণা, যা তৎকালীন মুসলিমসমাজ গ্রহণ করে ছিল আল-কোরআনের সামলজস্যপূর্ণ থাকায়।

তারপরে সে গাছপালা থেকে বের হয়ে, বৃষ্টি, ঠান্ডা এবং তুষার ইত্যাদি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করল। সে চলে গেল বজ্র এবং বজ্রপাত সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপরে সে আকাশের, ও নভোমন্ডলের বস্তু ও তাদের গতিবিধি, তাদের নিজ অবস্থান এবং তাদের উত্তরণ ও এরকম বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করল।

ততক্ষণে সে কৈশোর পেরিয়ে গিয়েছিল, তাঁর মুখে নমনীয়তা এসে গেছে, তার বুদ্ধি দৃঢ় এবং তার যুক্তি এখন শক্তিশালী ও দুর্দান্ত। তারপরে সে মনযোগ দিয়েছিল যে, এই জিনিসগুলি, প্রাণীরা, যারা যথার্থভাবে এবং যুক্তি বিন্যাসে সাজানো যাদের অস্তিত্ব, তারা কি তারা নিজেরাই নিজেরাই হচ্ছে? নাকি অন্য কিছু তাদেরকে অস্তিত্বে নিয়ে আসে ও তা

বজায় রাখে? যদি অন্য কোনও কিছু হতে হয়ে থাকে তবে এটি কি হতে পারে, যা তাদের অস্তিত্বে নিয়ে আসে? তারই বা বৈশিষ্ট্যগুলি কী তার হতে পারে? এ চিন্তায় সে মশগুল হল। সে পর্যবেক্ষণ করেছিল যে অনেকগুলি বস্তু কখনও কখনও উপস্থিত থাকে এবং অন্য সময়ে থাকে না এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে এই দেহগুলির অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা যুক্তিযুক্তভাবে উদ্ভট নয়। এটা সাপেক্ষীক। সে দেখেছিল যে কোনও কিছু অস্তিত্ব বা অনঅস্তিত্ব কোন কিছুই সাপেক্ষে সংঘটিত হচ্ছে। এরা নিজে থেকেই প্রকাশিত হতে পারে না। কারণ তা হলে অস্তিত্বের প্রণালী কখনও থাকত না। যেহেতু এগুলি একটা নিয়ম-প্রণালী থেকে হয়। সুতরাং এটি অন্য জিনিস থেকে আসতে হবে।

তদুপরি যে সন্ধ্যা জিনিসগুলির অস্তিত্ব নির্ধারণ করে তা নিজেই সাপেক্ষিক কিনা? সে দেখল, যদি এটি কিছুই সাপেক্ষে হয় তবে তার অস্তিত্ব অবশ্যই সমানভাবে অন্য কোনও কারণ থেকে আসতে হবে, এবং এইভাবে সীমাহীনভাবে চলবে; সুতরাং জিনিসগুলো তাদের অস্তিত্বের কারণ বিধান করতে পারে না, যা নিজে সাপেক্ষীক। এভাবে কারণ এবং কারণগুলির ফল জমা হতে থাকবে সীমাহীন ভাবে এবং তাদের যোগফলগুলি সাপেক্ষপূর্ণ হবে। সুতরাং জিনিসগুলি তাদের অস্তিত্বের কারণ বিধান করতে পারে না, সে সন্ধ্যা তাদের থেকে পৃথক, এবং ভিন্ন, তাদের যোগফলের থেকেও। যা নিজে সাপেক্ষিক নয়, নির্ভরশীল নয়। সুতরাং এটি অবশ্যই পরম, নিরঙ্কুশ (absolute) হতে হবে। অতএব এই জিনিস গুলির অস্তিত্বের অবশ্যই একটি কারণ থাকতে হবে এবং **এটিই আল্লাহ**।^৫ তাকে অবশ্যই সমস্ত কিছু প্রয়োজনীয়ভাবে জানতে হবে, অন্যথায় তাঁর কর্ম সঠিক হবে না। অবশ্যই তাঁর সমস্ত কিছুই সর্বাধিক যত্ন নিতে হবে। কারণ অন্যথায় সবকিছু তার সর্বোত্তম সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে থাকবে না বা হবে না। সুতরাং কামিলের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই বিদ্যমান জিনিসগুলির অবশ্যই অস্তিত্বের কারণ থাকতে হবে যা প্রয়োজনীয়ভাবে বিদ্যমান, সমস্ত কিছু জানেন এবং সমস্ত কিছুই যত্ন নেন।

তৃতীয় বিভাগ: কামিল কীভাবে নবীদের অস্তিত্ব জানতে পেরেছিল

কামিল যখন তাঁর জ্ঞানের এক পর্যায়ে পৌঁছল, তখন মানবীয় জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধির কাছে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর মন পরিশুদ্ধ হয়ে উঠল। সে তাঁর সৃষ্টির উপর স্রষ্টার দাবীগুলি কী তা জানতে আগ্রহী উঠল। তার কাছে প্রতিভাত হল স্রষ্টার উপাসনা করা এবং তাঁর আনুগত্য করা করা উচিত কিনা এবং মহামহিমের সাথে তাঁর সম্মত উপাসনাটি জানার পদ্ধতি কি এবং সে কিছু সময়ের জন্য এ নিয়ে ভাবতে থাকল।

এরপরে এমন ঘটনা ঘটল যে প্রচন্ড এক ঝড়ে সেই দ্বীপে একটি জাহাজ আছড়ে পড়ল। জাহাজে বেশ কিছু ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য লোক ছিল। প্রবল বাতাসের ফলে জাহাজের যে ক্ষতি হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করতে তারা কিছুদিন সেখানে রইল। জ্বালানি কাঠ, ফল ও খাবার সংগ্রহের জন্য যাত্রীরা দ্বীপের চারপাশে হেঁটে

^৫ এটা আল্লাহর অস্তিত্বের মুসলিম ধর্মতত্ত্বে মৌলিক যুক্তির অন্যতম।

অনুসন্ধান করল। কামিল সব দূর থেকে দেখল। এগুলিকে দেখে প্রথমে এড়িয়ে চলল। তারপর তারা তাকে যেন না দেখে, সাবধানতার সাথে তাদের কাছাকাছি গেল। কামিলের দেহের আকার দেখে তারা ভয় পেয়েছিল। তারা কামিলকে ডাকতে লাগল। কিন্তু সে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল। তারা তার দিকে কিছু রুটি ও খাবার নিক্ষেপ করল, যা তাদের কাছে ছিল। সে যখন তা খেয়ে ফেলল সে দেখল যে এটা ভাল জিনিস। সে আগে কখনও এরকম প্রস্তুত খাবার খায় নি। আস্তে আস্তে সে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। তারা তাকে কাপড় দিয়ে আবৃত করল। সে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হল। তাদের খাবার খেল এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হল।

তারা তাকে তাদের ভাষা শেখানোর চেষ্টা করল এবং সে এর অনেক কিছুই শিখতে পারল। তারা তাদের শহরগুলির অবস্থা এবং সেগুলিতে কি মানুষ খায় সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করল। সে এতে অবাক হল কারণ সে ভেবেছিল যে এই দ্বীপ ছাড়া আর কোনও দেশ নেই এবং সে তাদের সাথে ভ্রমণ করতে আগ্রহী হল। তাই তারা তাকে দ্বীপটির নিকটে একটি শহরে নিয়ে গেল।

সে শহরের বাসিন্দাদের খাবার খায়, এবং তাদের পোশাক পরে এবং প্রচুর আনন্দ পায়। সে স্মরণ করে তাঁর জীবনটা কত করুণ ছিল। সে সর্বদা ঠান্ডা এবং গরমে নগ্ন থাকত এবং নিজেকে প্রাকৃতিক খাদ্যসামগ্রীতে সীমাবদ্ধ থাকত এবং বনের পশুরা সর্বদা তাকে আক্রমণ করত এবং কামড়াত।

সে বুঝতে পারল, যেহেতু তার কাছে প্রাকৃতিক অস্ত্র নাই, তৈরী করা খাবার এবং পোশাকের প্রয়োজন, তাই একা থাকলে ভালভাবে বাঁচতে পারবে। মানুষের সামাজিক হওয়ায় প্রয়োজন, সুতরাং সে এমন একটি সম্প্রদায়ের সাথে থাকতে পারে যার কিছু সদস্য খাবার বপন করবে, অন্যরা লাঙ্গল চালাবে, কেউ রুটি তৈরি করবে, কেউ পরিবহনের কাজ করবে, অন্যরা কাপড় সেলাই করবে ইত্যাদি।

তারপরে সে প্রভাবিত হয়ে নিজেকে বলল, মানুষের ভাল জীবনযাপন করার জন্য যেহেতু এই সমস্ত কিছুই প্রয়োজন। আর বেচাকেনা, ভাড়া নেওয়া ইত্যাদির মতো কাজে নিজেদের মধ্যে মতভেদ, বিরোধ সৃষ্টি হবেই, কারণ প্রত্যেকই মনে করবে তার দাবী সঠিক, নিজের কোন দায় নাই। সুতরাং মানুষ কেবল তখনই ভাল ভাবে বাঁচতে পারে যখন সে এমন একটি সম্প্রদায়ের সাথে থাকে যারা তাদের মধ্যে একটি আইন রাখে যার মাধ্যমে সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করবে।

এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন আইনটি আনুগত্য ও গ্রহণযোগ্যতার সাথে গৃহীত হবে এবং এটি কেবল তখনই হবে যখন এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বলে বিশ্বাস করা হবে এবং যখন তা এমন ব্যক্তির কাছ থেকে দেওয়া হবে যাকে তারা সত্যবাদী বলে মনে করে এবং তিনি তাদের জানায় যে, এগুলি আল্লাহর পক্ষ থেকে। এই ব্যক্তিটি মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী হতে পারে না, কারণ প্রাণীরা কোনও কথা বলতে পারে না, তারা আইন আদান প্রদান করতে পারে না। তিনি এমন কেউ হতে পারবেন না, যাকে বেশিরভাগ মানুষই বুঝতে পারবে না, যেমন ফেরেস্টা^৬ বা জিন, কারণ

^৬ 'আমি ফেরেস্টা নই, বরং কুরাইশের এক মহিলার পুত্র, যিনি কাটা কাটা, শুকনো মাংস মাংস খেতেন'। (হাদিস)

তখন বেশিরভাগ লোক তার কাছ থেকে আইন জানতে পারবে না। অতএব এই ব্যক্তি অবশ্যই একজন মানুষ হতে হবে।

অতঃপর কামিল বুঝল ও নিজেকে বলল : যেহেতু এই বাহক একজন মানুষ, তাই তাকে অবশ্যই এমন একটি গুণ দ্বারা আলাদা করা উচিত যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এবং অন্যরা তাকে সত্যবাদী বলে মনে করে। যখন তিনি তাদের জানিয়ে দেন যে তিনি যা আনেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এটি তখনই ঘটবে যখন তিনি এমন একটি গুণ দ্বারা আলাদা হবেন যেমন, তিনি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখেন। তাছাড়া এটা হত না। আর তাঁর কাছ থেকে যা কিছু বর্ণনা আসে, তা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য এবং এটিকেই অলৌকিক ঘটনা বলা হয়।^৭

সুতরাং এই ব্যক্তিকে অবশ্যই এমন অলৌকিক কাজ করতে হবে যার দ্বারা তারা জানবে যে তিনি যা আনবেন তা মিথ্যা নয় এবং বৃথা নয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য। এই গুণটি যাঁর কাছে, তিনি একজন নবী। সুতরাং কামিল বুঝতে পারল, যে এই নবীজীর (স) অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই মানুষের ভাল জীবন পরিপূর্ণ হয় এবং তাঁর অস্তিত্ব মানুষের পক্ষে ও সাধারণ উপকারের এবং চূড়ান্ত মঙ্গলের। আল্লাহ তা'য়ালার এ বিষয়টি জানেন এবং তাই তাঁর সৃষ্টির যত্নের কারণে এই নবীর অস্তিত্ব প্রয়োজন (ওয়াজিব)। এটা ভাবাই যায় না যে, এই নবীর সৃষ্টি আল্লাহ বাদ দিয়েছেন, যা সাধারণের উপকারে আসবে। যদি তিনি গোপরাঙ্গের চুলের (شعر العانة) মত এবং অনুরূপ জিনিসগুলি, যা কেবল অল্পই মানুষের জন্য উপকারী, তৈরি করা বাদ না দেন তাহলে এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাদ দিতে পারেন না। সুতরাং কামিল বুঝতে পারল যে এই সমাজের জন্য নবীর (স) সৃষ্টি প্রয়োজনীয় ছিল।

অতঃপর সে এই সমাজের নবীর (স) উপকারী ভূমিকার উপর চিন্তা করল এবং এটির তিনটি গুণ পেল।

প্রথমত: তিনি মানব জাতির কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছে দেন ;

দ্বিতীয়ত, তিনি মানবজাতির কাছে আল্লাহর মহিমা এবং অন্যান্য গুণাবলী অবহিত করেন;

তৃতীয়ত, তিনি পুনরুত্থান এবং সুখ ও দুঃখ যা ভবিষ্যতে তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে তা জানিয়ে দেন।

তারপরে কামিলের প্রতিভাত হল এবং নিজেকে নিজে বলল

^৭ মুজিতা- ইসলামী ধর্মতত্ত্বের নবীর(স) সত্যবাদিতা জন্য মুসলমানদের শাস্ত্রীয় যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

: এই বিষয়গুলি কেবলমাত্র কিছু স্বভাবের মানুষ অসুবিধা সহকারে গ্রহণ করবে। কারণ অনেকে, অসুবিধা সহকারে স্বীকার করতে হয় এমন কোন কিছুই অস্তিত্ব - যার কোনও দেহ নাই, শরীরে শক্তিও নাই, কোন দিকে নয় ও যা নির্দেশ করা যায় না ইত্যাদি তাদের বুঝতে কষ্ট হয়। অনেকে কেবল অনেক কষ্টে চিন্তা করে নবী প্ররণের কারণ বুঝতে পারবে এবং অনেকে কেবল মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান এবং অনন্ত জীবনে ' সুখ-স্বাচ্ছন্দে বা জাহান্নামে' থাকা ও অন্যান্য বিষয়গুলি যা উপকারী, তা কষ্ট করে কল্পনায় আনতে পারে। এই সময়ের মানুষেরা আইনের নিয়ম- কানূনের সাথে পরিচিত নয় এবং এর মতবাদগুলিতে অভ্যস্ত নয়, এরা সড়াসড়ি এটিকে অস্বীকার করবে এবং নবীদেরও অবিশ্বাস পোষণ করবে।

কামিল চিন্তা করল, যেহেতু এই বিষয়গুলির গ্রহণযোগ্যতা কঠিন, লোকেরা তা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকত। যদি নবী হঠাৎ করে মানব সমাজে প্রকাশ হতেন। সে ভাবল, যদি না পূর্বে থেকে ক্রমাগত ভাবে অন্য নবীরা এসে আগেই মানুষদের প্রায় সবাইকে একটা বোঝার কাছাকাছি অবস্থায় নিয়ে আসার কাজ না করেন, তবে মানুষেরা নবীকে(স) দুঃতার সাথে মিথ্যাবাদী হিসাবে ঘোষণা করত। সুতরাং এটিই উপযুক্ত যে আগে প্রথমে কিছু নবীকে এই বিষয়গুলির কিছু অংশ প্রকাশ করা উচিত যা মানুষ সহজেই গ্রহণ করবে এবং যা মানবজীবনের সংরক্ষণ ও সুন্দর জীবনের জন্য জরুরীভাবে প্রয়োজন।

এককথায় আল্লাহর বিধান মানুষের কাছে স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে। নবী যিনি প্রথমে আসবেন, তিনি সেই বিষয়গুলি প্রকাশ করবেন যা সহজে বোঝার মত, যাতে তাদের গ্রহণযোগ্যতা সহজ হয় এবং মানুষেরা তার বিরোধিতা কম করে। যতবারই অন্য নবী আসবেন, তিনি তার পূর্বসূরীর চেয়ে বেশি কিছু দান করে থাকবেন, যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় আইনটি সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর এভাবে যখন মানুষেরা কিছুটা হলেও আল্লাহকে জানতে পেরেছিল এবং তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলি জানার জন্য আগ্রহী হয়, তখন পরবর্তী নবীগণ এ ব্যাপারে যা প্রকাশ করেছেন তা মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। তারপরে, যখন মানুষেরা আল্লাহর গুণাবলী এবং মহিমা জানবে ও তাঁর নিখুঁত ক্ষমতা উপলব্ধি করবে, তখন তাদের পক্ষে জীবনের আগমনী বর্ণনা - পরকাল এবং চিরন্তন সুখ এবং দুঃখ যা এটি সাথে নিয়ে আসে, তা বিশ্বাস করা কঠিন হয় না। সুতরাং তাদের পক্ষে নবীদের বিশ্বাস করা সহজ হয়ে যায়, যা পরবর্তী সময়ের নবী মানুষের জন্য যে উপদেশ নিয়ে আসে।

কামিল এই কারণেই বুঝল যে নবী হওয়ার বিষয়টির (নবুয়ত) উদ্দেশ্যটি একজন নবী দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, বেশ কয়েকজন হতে হবে। তাঁদের মধ্যে প্রথম যিনি তত্ত্ব আনবেন তা, তৈরি করবে পরবর্তী মানুষদের তাদের নবীদের তত্ত্বগুলি বুঝতে।

পরবর্তী নবীদের প্রত্যেককে অবশ্যই আদেশগুলি পুনরাবৃত্তি করতে হবে যে আদেশটি তাঁর পূর্বসূরীরা এনেছিলেন, তাঁদের শ্রদ্ধা করবেন এবং তার মতবাদ গ্রহণ করবেন। যতক্ষণ না শেষ নবুয়তের উপকার ও কাজ সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং শেষ নবী(স) পূর্বের নবীগণ যা এনেছিলেন তা জানবেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণ যা প্রকাশ করেছেন তা তিনিও প্রকাশ করবেন। সুতরাং শেষ নবী সকল নবীর সেরা হবেন ^৮ এবং অন্য সকলের চেয়ে তাঁর(স) দ্বারা নবীর দায়িত্বের (নবুয়তের) পূর্ণাঙ্গতা সম্পন্ন হবে। সুতরাং এটা যথায়ত যে যিনি পরে আসবেন তিনি পূর্ববর্তীর চেয়ে উত্তম হবেন, তবে শর্ত হল, মানবগুষ্ঠির মধ্যে কোন পরিবর্তন না হওয়া চাই, যা বিপরীত থেকে দিকে প্রয়োজনীয়। কারণ এমন হতে পারে, কোন নবী একটা সময়ের জন্য আসলেন

তার দ্বারা নবুয়তের লক্ষ্য পূর্ণ করলেন। তারপর সে সময়ের সব মানুষ হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। হোক তা মহাপ্লাবন অথবা মহামারী (প্লেগ) বা তেমন কোন কিছু। তার পর যে মানবগোষ্ঠী আসবে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, তা এমন হবে যে (নতুন মানুষদের কাছে) কোন নবীই পূর্বে আসেন নাই।

এ কারণে তখন আবার মানুষদের সত্য সমর্থন করাতে ক্রমাগত ভাবে তৈরী করতে, প্রথম থেকে কাজ শুরু করতে হবে। এতে করে যা হবে, নতুন জনগোষ্ঠীর যে নবী আসবেন তিনি সেই অবস্থানে থাকবেন, যে অবস্থানে একেবারে দুনিয়ার শুরুতে যে নবী এসেছিলেন। তাহলে এই জনগোষ্ঠীর নবী, তার পূর্বসূরীরা যারা বিলুপ্ত হয়েছেন তাঁদের চেয়ে কম পূর্ণতা (সম্পূর্ণ) সম্পন্ন হবেন। এটা প্রয়োজনীয় যে প্রত্যেক নবীকে তাঁর পূর্ববর্তী নবীর চেয়ে বেশী (সম্পূর্ণ) উত্তম হবেন, এটার ব্যতিক্রম শুধু শেষ নবীর বেলায়, যিনি হবেন চূড়ান্ত ও শেষ নবী। তিনি অবশ্যই যে কোন পূর্ববর্তী নবীর চেয়ে অধিক উত্তম। কারণ তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। সুতরাং তাঁকে সব কিছু শেখাতে হবে যা নবুয়তের দায়িত্ব পূর্ণ করতে প্রয়োজনীয়। সুতরাং যিনি শেষ নবী হবেন তিনি অবশ্যই সব নবীর চেয়ে সর্বচেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেন। কামিল এভাবে নবী ও শেষ নবীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল।

^৮ এটি স্বীকৃত ইসলামী সাধারণ তত্ত্ব

দ্বিতীয় পর্ব: **কামিল কীভাবে নবীজির(স) জীবন কাহিনীটি জানতে পারল**

প্রথম অধ্যায়ঃ শেষ নবীর (স) বংশতালিকাঃ

ফজল বিন নাতিক বলল (গল্প কার), কামিলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যেহেতু শেষ নবী(স) সকল নবীর চেয়ে সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ হবেন, এটা প্রত্যাশিত যে তিনি শ্রেষ্ঠ মানব ধারা থেকে আসবেন। যেন মানুষ তাকে সম্মান করে ও তাঁর নির্দেশ মানে। সবচেয়ে সম্মানিত ধারা যেখানে পৌঁছেছে যাকে সমভাবে সকল ধর্মই উচ্চ সম্মান ও আসন দেয়। তিনি ইব্রাহীম (আ)। তাঁর অবশ্যই ভিন্ন কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী ভুক্ত হওয়া সম্ভব হবে না। যাতে যখন তিনি নিজ বিধি-বিধান দিবেন তাঁকে ধর্মত্যাগী বলে তাঁর পূর্ববর্তী সহ-ধর্মান্বলস্বীরা বলতে পারে। সুতরাং তার ইয়াকুব(আ) অথবা ঈসা(আ) এর বংশধর হওয়া উচিত হবে না। কারণ তাতে খৃষ্টান বা ইহুদি হতে হবে। তাতে ধর্মচ্যুতির অভিযোগ আসবে। তাঁর ইসমাইল(আ) এর বংশধর হওয়া উচিত, বিশেষতঃ হাশেমী বংশের, কারণ এ বংশ ইসমাইল (আ) এর বংশের শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ যিনি সর্বশেষ নবী তাঁর জন্ম স্থানের উপরঃ

কামিল গভীর ভাবে চিন্তা করে ভাল ভাবে বুঝতে পারল যে, যেহেতু এই নবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্ত্রানী হতে হবে, তিনি কিছুতেই মরুভূমি থেকে আসতে পারেন না। যেহেতু এসব এলাকার লোকদের বুদ্ধি উন্নত হয় না। তাঁকে শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসতে হবে। তাঁর আসা উচিত নয় দুঃস্থ কোন শহর থেকে। এমন শহর যার অধিবাসীরা শহরে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। বিশেষতঃ যে শহর ধর্মীয় দিক থেকে সুপরিচিত। প্রাচীন কাল থেকেই উপাসনার আশ্রয় স্থল হিসাবে পরিচিত। আর সব চেয়ে পুরাতন উপাসনার আশ্রয়স্থান হল কা'বা। সুতরাং এই নবীর জন্ম হওয়া উচিত মক্কায়। অপর দিকে এই নবীর মৃত্যু হওয়া উচিত নয় তাঁর জন্মস্থানে। কারণ তাঁর কবরস্থান পরিদর্শন তাঁর মতবাদের প্রতি আকর্ষণ সংরক্ষণে অবদান রাখবে। আর বিশেষতঃ তিনি সর্বশেষ নবী। এখন যদি তিনি(স) মক্কায় ইন্তেকাল করতেন ও মক্কায় কবর হত, তাহলে তাঁর কবর জিয়ারত দেখা হত কা'বা সফরের একটা অনুশঙ্গ হিসাবে। কবর জিয়ারতের সতন্ত্র

ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। তাঁর কবরস্থান ও স্বয়ং নবী(স)কে মানুষ ভুলে যেত এবং তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক আইনের কিছুই কার্যকর থাকত না। সুতরাং তাঁর (স) কবরস্থান অন্য স্থানে হওয়া উচিত।

আবার তাঁর বাসস্থানের পরিবর্তন বস্তুগত কারণে হওয়া উচিত হবে না, অথবা তাঁর স্বাধীন ইচ্ছায় হওয়াও উচিত হবে না, কারণ তা হলে বিষয়টা এক স্থান থেকে আর একটা ভাল জায়গায় পরিবর্তনের মত হবে। সুতরাং তাকে(স) বাধ্য হতে যেতে হবে। কিন্তু নির্বাসন বা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নয়, এতে তাঁর(স) মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। অবিশ্বাসী বিরোধীদের গভীর ষড়যন্ত্র ও তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে। এ থেকে এই ষড়যন্ত্রকারীদের নিচু মানসিকতার পরিচয় ও রাসূল(স) এর শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর যে তাকে হত্যা ষড়যন্ত্র অবিহত করে সাহায্য করেছেন তা স্পষ্ট হয়।

পরবর্তীতে শেষে এই নবীর(স) মক্কা দখল করা ও নিয়ন্ত্রণে নেওয়া উচিত যাতে করে বিদায়ী যাত্রা (হজ্জ) ^৯ করা যায় ও তাঁর(স) অনুসারীদের তাঁর নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া যায়। যে শহরে রাসূল(স) বসবাসের জন্য যাবেন এবং যেখানে তিনি ইলেকাল করবেন তা তাঁর পিতার ইলেকালের শহর হলে সবচেয়ে উপযুক্ত হয় ^{১০} এটা 'মদিনা' এবং এটাই যথার্থ হবে যে তিনি সেই শহরের শাসক হবেন।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ : শেষ নবীর (স) লালন-পালনের বিষয়টি কীভাবে হয়ে থাকবে।

অতঃপর কামিল চিন্তা করল, শেষ নবী(স) হিসাবে, কিভাবে জন্মের পর লালিত পালিত হওয়া উচিত।

এই নবীকে যেহেতু নবীদের সর্বশেষ হতে হবে, তাই প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করার জন্য তার সবচেয়ে সুখম মেজাজ এবং চরিত্র হওয়া উচিত। সুতরাং তার পিতা ইলেকাল হওয়া উচিত তাঁর মাতার পূর্বে, উপরন্তু তিনি মক্কার বাহিরের অন্য মহিলার

৯ ১০ম হিজরী(৬৩২খ) বিদায় হজ্জ।

১০ মহানবী (স) পিতা এক ব্যবসায়িক ভ্রমণে মদিনায় ইলেকাল করেন।

দ্বারা দুধ মাতা হিসাবে লালিত পালিত হয়ে থাকবেন এবং পরিশেষে তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুরুষ আত্মীয়দের , যেমন দাদা, চাচা দ্বারা লালিত পালিত হয়ে থাকবেন। কামিল ভেবে দেখল, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির মেজাজ তার পিতা-মাতার কাছাকাছি থাকে, আর এমন কিছু ঘটে যা এটি আরও জোড়ালো ও সুসম করে তোলে এবং এর মধ্যে স্তন্যপান সম্পৃক্ত। তদুপরি, তার প্রথম বেলে উঠা মক্কার বাইরে হওয়া উচিত। যাতে বিভিন্ন জলবায়ুর প্রভাব তাঁর ভারসাম্যপূর্ণতায় কারণ হিসাবে কাজ করে। এই দুধ-মা তাঁর প্রতি খুব উৎসর্গী হওয়া উচিত। যাতে তার দুধ তার সহনীয় হয়। এইটা তখনই নিশ্চিত হবে যখন দুধ মাকে এ আশ্বাস আশ্বাস পায় হয় যে তাঁর লালন পালন ধাত্রীর জন্য আশীর্বাদ। এছাড়াও তাঁকে প্রথম থেকেই তাঁর পিতা নয়, অন্যের দ্বারা পালিত হওয়া উচিত। যাতে প্রশিক্ষকের অনুকরণে তাঁর চরিত্রটি ভারসাম্যপূর্ণ হয় এবং এর জন্য একজন প্রশিক্ষক পর্যাপ্ত নয়, কারণ চরিত্রের উপর শিক্ষার প্রভাব দুর্বল এবং নার্সিংয়ের মাধ্যমে পরিবর্তনে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। এছাড়াও, শিক্ষাবিদদের বিপরীতে, বেশ কয়েকটি মহিলার ধাত্রী স্ব ক্ষতিকারক। নবীর মা তার পিতার চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারেন, কারণ পুরুষ সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব পিতাদের চেয়ে দুর্বল।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ : এই নবীর ইচ্ছা সম্পর্কে।

কামিল চিন্তা করল, খাতামূন নবী(স) হিসাবে নবী(স) এর আকাঙ্খাগুলি(الشهوات) কেমন হওয়া উচিত। নিজে নিজে

ভাবল, যেহেতু এই নবী(স) এর মেজাজ খুব ভারসাম্যপূর্ণ, , তেমনি তাঁর আকাঙ্ক্ষাগুলিও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত। সাধারণভাবে তার আকাঙ্ক্ষাগুলি মাঝারি শক্তির হওয়া উচিত। এটি উপযুক্ত যে তার কিছু আকাঙ্ক্ষা দুর্বল হওয়া উচিত, যেমন খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা, কম খাওয়ার সাধুগণের বৈশিষ্ট্য। আর বেশি পরিমাণে খাওয়া পেটকের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য পছন্দনীয় আকাঙ্ক্ষাগুলি শক্তিশালী হওয়া উচিত, যেমন সুগন্ধির অভ্যাস, এবাদতের আগ্রহ এবং নারী-প্ৰীতি^{১১}।

সুগন্ধির অভিলাষ, এটির কারণ এর ব্যবহার ব্যক্তিদের উপর একটি সম্মান জনক ছাপ দেয়। যখন কারও সাথে একজন মানুষ মিলিত হয়। যাতে তাঁর সম্পর্কে খুব সম্ভ্রান্ত চিন্তা করে। আর দুর্গন্ধযুক্ত লোকেরা ঘৃণিত হয়।

যৌনস্পৃহা বিষয়ে, এই ইচ্ছাটা পুরুষের জন্য সর্ব প্রশংসিত, পুরুষের চিহ্ন। আর এবাদতের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে - নবীর অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্য লাভ প্রয়োজনীয়। তিনি যথায়ত ভাবে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকবেন, এতে তা থেকে তিনি অপার আনন্দ পাবেন।

^{১১} হাদিসের বর্ণনা - আমি পৃথিবীর সুগন্ধি, নারী ও ইবাদত পছন্দ করতে এসেছি, অনুসরণে।

যেহেতু এই নবী(স) যৌনস্পৃহা শক্তিশালী, এবং যেহেতু এটি অচিন্তনীয় যে স্ত্রী ছাড়া অন্য ব্যক্তিদের কামনা করা কল্পনা করা যায়। কারণ এটি খুব খারাপ এবং বিপর্যয়কর পুরুষদের বৈশিষ্ট্য। তিনি অবশ্যই বেশ কয়েকজন স্ত্রী গ্রহণ করে থাকবেন এবং প্রায়শ মিলিত হবেন তাঁদের সাথে।

পঞ্চম অধ্যায় : এই নবীর(স) চেহারা সম্পর্কে।

অতঃপর কামিল ভাবল, নবী(স) এর চেহারা কেমন হওয়া উচিত। এবং ভাবল, এই নবীর বাহ্যিক চেহারা এমন কিছু থাকতে পারে না যাতে কেউ অপছন্দ করতে পারে। তিনি অত্যধিক খাট হতে পারেন না, কারণ এই জাতীয় লোককে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। অত্যধিক লম্বা হবেন না, কারণ এই লোকগুলিকে দুর্বল বুদ্ধিমত্তার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই ধরনের লোকদের দেহে কোনও ত্রুটি থাকতে পারে। এদের উপেক্ষা করা হয় এবং ‘অশুভ’ হিসাবে বিবেচিত হয়। তাঁর মুখের মধ্যে বা কোন অঙ্গে বিকৃতি বা অসুস্থতা থাকতে পারে না। যার কারণে লোকেরা উপেক্ষা করে এবং এড়িয়ে যেতে পারে। তার অঙ্গগুলি সুসম ও সুগঠিত ছাড়া হতে পারে না কারণ মানের ভারসাম্যের অভাব থেকে আসে। একই কারণে তার পেট অত্যধিক চর্বিযুক্ত হতে পারে না, তার ঘাড় খুব বেশি মোটা হতে পারে না। তার আঙ্গুলগুলিও খুব ছোট হতে পারে না। তার মুখটি দীর্ঘ নয়, তার চোয়ালগুলিও খুব বড় হতে পারে না। তার অবশ্যই সুরেলা, সুসম অঙ্গ থাকতে হবে। মাঝারি বর্ণের হতে হবে, অত্যধিক চর্বিযুক্ত বা অত্যধিক পাতলা নয়। তাঁকে অবশ্যই হাসিখুশি ও প্রফুল্ল, শক্তিশালী ও ভাল হজম, তীব্র ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিমত্তা এবং স্বচ্ছ বাকশক্তির অধিকারী হতে হবে। কারণ এগুলি সুসম মেজাজের মানুষের গুণাবলী।

ষষ্ঠ অধ্যায় : শারিরিক অসুস্থতা এবং জীবনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে এই নবীর শর্ত।

অতঃপর কামিল চিন্তা করল, নবী(স) এর কি অসুস্থ হওয়া উচিত ও কিভাবে। সে মনে মনে বলল, এমন কিছু রোগ রয়েছে যা এই নবীর ঘটতে পারে না, যেমন পাগলামি এবং মৃগী, কারণ যাঁরা এটা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কথা বলতে (বা অন্যকে সম্বোধন করতে), কোন বার্তা পৌঁছে দিতে এবং আল্লাহর ধর্মীয় আইন বর্ণনা করতে অযোগ্য বলে

বিবেচনা করা হয়।। তাঁর সাদা কুষ্ঠরোগ (বারাস) থাকতে পারে না, কারণ লোকজন এ থেকে আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসতে চায় না, তাঁকে এড়াতে চাইতে পারে। আর না তিনি কুষ্ঠরোগের (জুমাম), না পঙ্গু, না এক চোখ অন্ধ বা উভয় পঙ্গু বা অন্ধ হতে পারেন।

তবে গরম রোগ যেমন জ্বর এবং সেই শীতজনিত রোগ যা ঘৃণা করা হয় না, যেমন জুকাম (coryza বা hay fever) এবং নাজলা (সর্দি, শ্লেষ্মা, catarrh), তাঁর ক্ষেত্রে হতে পারে। এই নবীর অবশ্যই অনেক রোগ হতে পারে তবে তার রোগগুলি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত এবং সহজেই নিরাময় হবে, কারণ ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের লোকেরা বাহ্যিক সংক্রমণের (ওয়ারিদাত) প্রতি সমানভাবে সাড়া দেয়, আর একপেশে মেজাজের লোকেরা দুঢ়ভাবে প্রতিরোধী এবং তেমনি সামান্য চিকিৎসাতে ভাল হয় না।

এই নবীর আয়ু সম্পর্কে কামিল চিন্তা করল, তাঁর বুদ্ধি পুরোপুরি বিকাশের জন্য তাকে এমন সীমাতে পৌঁছাতে হবে, যাতে তাঁর নবুয়তের মিশনে বিনিয়োগ করা যায়। এটি পরিণত বয়স (কুহলা)। তবে তাকে অবশ্যই এমন একটি পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে না যেখানে তার মধ্যে সংবেদনশীলতা এবং বিচারের অভাব উপস্থিত হয়। সুতরাং তাকে অবশ্যই পরিপক্ব হওয়ার পরে ইন্তেকাল করতে হবে, বার্ষিক্য তাকে ধরে ফেলার আগেই। ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের ব্যক্তিদের মধ্যে যা ঘটে এবং এটি বাষট্টি বা তেষ্টি বছরে।

সপ্তম অধ্যায়: এই নবীর সন্তানদের উপর।

কামিল চিন্তা করল, এই শেষ নবী(স) এর কত জন সন্তান হওয়া উচিত অথবা উচিত না।

সে নিজে নিজেকে বলল, যেহেতু নবী(স) অনেক স্ত্রী সহবাস হত, তাই তিনি নিঃসন্তান হলে পরিপূর্ণতার অভাব হত। তাঁর মেজাজটি সুস্থ ছিল তাই তাঁর পুত্র ও কন্যা উভয় থাকতে হয়ে থাকবে। তবে তাঁর পুত্রদের তাঁর পরে বেঁচে থাকতে হবে না কারণ তারা যদি বেঁচে থাকে তবে তাদের উচিত হবে নবী হওয়া। যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের হয়েছিল, যার পুত্ররা তাদের উত্তরসূরি হয়েছিল। তবে এটি অসম্ভব ছিল যেহেতু তিনি সর্বশেষ নবী ছিলেন। বিপরীতে, তাঁর মেয়েরা দীর্ঘ বাঁচতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়: নবী(স) যেভাবে অনুগামীদের ডাকতেন

অতঃপর কামিল ভাবল, যেহেতু এই সমাজের নবী(স) অতি সম্মানিত ছিলেন যখন তাঁর মিশন শুরু করেছিলেন, তাই তিনি রাজা বাদশাহদের কাছে যেতে পারেন না, যেমন মুসা ফেরাউনের কাছে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁকে যথার্থ শ্রদ্ধার সাথে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে বাদশাহকে সম্বোধন করতে হত। এতে তাঁর (স) মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত। তিনি তা না করলে তাকে অভদ্র হিসাবে বিবেচনা করা হত। শেষ নবী স. কোন নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য নয়, যে সেই গোত্রের রাজা বা প্রধানকে প্রথমে আহ্বান করতে হবে, পূর্ববর্তী নবীগণের মত। তার মিশন পুরো মানবজাতির জন্য ছিল, কোনও পার্থক্য ছাড়াই।

তাঁর বাণীর প্রচার শুরুতে মৃদু ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে করতে হয়েছিল এবং পরে যখন তাঁর অনুসারীরা আরও বেশি সংখ্যক হয়েছিল তখন বিরোধীরা তাদের আক্রমণ করে থাকবে আর পরিনতিতে তাঁকে শক্তি তরোয়াল ব্যবহার করতে হয়ে থাকবে।

নবম অধ্যায়: এই শেষ নবীর (স) নাম সম্পর্কে

কামিলের কাছে যখন এই শেষ নবীর (স) মহত্বের বাধ্যবাধকতা স্পষ্ট হল, তার কাছে প্রতিভাত হল, যে তাঁর নাম, পিতার নাম অথবা দাদার নাম, এমন কিছু হওয়া উচিত নয় যা ঘৃণ্য কিছু স্মরণ করে দেয় যেমন, জমির সার (زبله), কুকুর (كلب), শাড় (ثوب)। তাঁর নাম না হতে পারে কোন নিচু মানের অর্থবোধক নাম^{১২}। অন্যদিকে, তাঁর নামটির অত্যাচারী শাহানশাহদের রাজা-বাদশাহদের মত অতিপ্রশংসনীয় অর্থ হওয়া উচিত নয়।

দশম বিভাগ: এই নবীর কিতাবের উপর।

অতঃপর কামিল চিন্তা করল, অন্য নবীদের (আ) যেমন কিতাব এসেছে, এই শেষ নবী(স) এর কি কিতাব থাকা উচিত। সে বুঝল যে, নবীদের যাদের কাছে শত্রু অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের তুলনায় নিকৃষ্ট না হওয়ার জন্যই, এই শেষ নবী(স) অবশ্যই একটি ধর্মগ্রন্থ থাকা উচিত। বিশেষতঃ তাঁর (স) আইন সংরক্ষণের জন্য জরুরী প্রয়োজনের কারণেই, বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই বইয়ের শৈলীটি সবচেয়ে নিখুঁতভাবে স্পষ্ট উচ্চমানে বর্ণিত হতে হবে।

^{১২} আরবদের ছেলেমেয়েদের অসংগত নাম দেওয়ার বা তাদের পশুর নামকরণের রীতি প্রচলিত ছিল।

তৃতীয় অংশ

কামিল কিতাবে নবীর ধর্মীয় অনুশীলন জানতে পারে

প্রথম অধ্যায়: এই নবী(স) আরোপিত আদর্শিক দায়িত্ব সম্পর্কে।

প্রথম বিভাগ: আল্লাহর গুণাবলী উপর এই নবীর(স) শিক্ষা।

ফাদিল ইবনে নাতিক (গল্পকার, story teller) বলল:

কামিল তার জীবনের যখন পূর্ণ প্রাণশক্তি ও পুরুষত্বে পৌঁছল, সে ভাবল, স্রষ্টার গুণাবলী সম্পর্কে নবী(স) এর কি শিক্ষা দেওয়া উচিত। কামিল সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, নবীর (স) অবশ্যই তাঁর মানুষদের শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, তাদের এক স্রষ্টা আছেন। তাদের স্রষ্টা অসীম জাঁকজমক ও মহিমাময়। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তাঁর মতো আর কিছুই নেই।

তাঁকে অবশ্যই মান্য করা এবং আরাধনা করা উচিত এবং তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তাঁর মতো আর কিছুই নেই। তিনি শ্রবণকারী এবং সব কিছু অবহিত। অন্যান্য গুণাবলী যা স্রষ্টার মহিমার সাথে যায়, যেমন তিনি সম্পূর্ণ, নিখুঁত শক্তি।

সাথে সাথে নবী এটা পরিষ্কার করবেন না যে, এ সব কিছুর পিছনে কিছু আছে যা তিনি প্রকাশ করেন নাই এবং তিনি বাধ্য করবেন না মানুষকে বিশ্বাস করতে, যা তারা সহজে বুঝতে সক্ষম নয় এবং কষ্ট কল্পনায় শুধু মাত্র বুঝতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি তিনি তাদেরকে বলেন যে, আল্লাহ, না পৃথিবীর অভ্যন্তরে বা বাহিরে আছেন, তিনি কোন দেহ নন এবং তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবন করা যায় না। তিনি কোন দিকে নন। কেউ তাঁকে নির্দিষ্ট করতে পারে না, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোন ইশারা বা চিহ্ন দিয়ে। নবী(স) এ বিষয়টি, বা এরূপ বিষয়গুলি সাধারণ লোকদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন না। যাদের কাছে এ গুলি অবোধ্য বা অর্থহীন মনে হবে। কালগ তা বুঝার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা ও

পড়াশুনা করে নাই। আর যদি তারা বুঝার জন্য বিশেষ কোন পড়াশুনা করেন, তারা বিভ্রান্ত ও বুদ্ধি ব্র্ঠ হবেন। তাদের অধ্যয়ন তাদের আয়-উপার্জন ও পেশা হতে বিরত রাখবে এবং এ সবে শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হবে। এটা নবীর প্রাথমিক উদ্দেশ্যের বিপরীত।

সুতরাং এ সমস্ত বিষয়বস্তু সাধারণ ভাবে বলবেন, বিস্তারিত বা ব্যাখ্যা করবেন না। তিনি এটা পরিষ্কার করে বলবেন না যে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। এরপরও তিনি বিষয়গুলির বিস্তারিত দিকের প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ করা বাদ দিবেন না। কিন্তু তার মানে ভাষনে রূপক বর্ণনা ও ইশারার মাধ্যমে বর্ণনা করা উচিত হবে, যা যথেষ্ট হবে ‘বিশেষ মানুষদের’ বিস্তারিত বুঝতে। অন্য দিকে সাধারণ মানুষেরা সীমাবদ্ধ থাকবে এসবের বাহ্যিক অর্থের দিকে যা তারা বুঝতে সমর্থ।

দ্বিতীয় বিভাগ: পরবর্তী জীবন সম্পর্কে শেষ নবী(স) এর শিক্ষা

অতঃপর কামিল এই জীবনের পরের জীবন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করল। ভাবল নবীর (স) কি এ সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব- না, সম্ভব হবে না। সে বুঝতে পারল যে, নবী (স) অবশ্যই বিস্তারিত ভাবে পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে থাকবেন। এটা সবচেয়ে কঠিন কাজ নবীর (স) শিক্ষার, যা শেষ নবী(স) এর আদর্শ ও মতবাদ থেকে বাদ যেতে পারে না। তিনি পরবর্তী জীবন ‘আধ্যাত্মিক ভাবে’ হবে এটার প্রতিনিষিদ্ধ করতে পারেন না। কারণ অধিকাংশ মানুষের বুদ্ধিমত্তা এটা বুঝতে অক্ষম যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, কষ্ট এবং আনন্দ উপলব্ধি কেমন।

কামিল গভীর ভাবে ভাবল, যদি একজন সাধারণ মানুষকে বলা হয়: তুমি যথায়ত (আল্লাহর) আনুগত্য করেছ এবং সঠিকভাবে উপাসনা করেছ, নিখুঁত ভাবে নিষিদ্ধ আনন্দ থেকে বিরত রয়েছ। এবং মানুষের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করেছ। সুতরাং আল্লাহ তোমাকে প্রেরণ করে দেবেন এমন এক জগতে, সেখানে তোমরা খেতে হবে না, পান করবে না, এবং যৌন সম্পর্ক করতে হবে না বা কাপড় পরা লাগবে না বা ঘুমাতে হবেনা। শুধু অবিরত প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশ করতে পারবে। এমনকি কোন পুরস্কার বা এর বিনিময়ে অন্য ব্যবস্থাও থাকবে না। - তাহলে এই যে সাধারণ মানুষ এই সুখ পেতে আগ্রহী হবে না। কিন্তু যদি তাকে বলে হয় : ‘ যদি তুমি ঐসমস্ত ভাল কাজ কর, এমন একটা জায়গায় তোমাকে পাঠানো হবে, যেখানে তুমি অফুরন্ত সুস্বাদু খাবার খাবে, যখন ইচ্ছা যৌন সুখ লাভ করতে পারবে, যেখানে সুরার, মধুর, অন্যান্য ঝরনা থাকবে। ’ তা হলে তার প্রতিক্রিয়া বা উত্তর সম্পূর্ণ আলাদা হবে।

নবী (স), ভবিষ্যৎ জীবন শুধু মাত্র শারিরীক উপস্থিতির হবে, এ বক্তব্যের ধারক হতে পারেন না কোন ভাবেই, কামিল ভাবল। কারণ আত্মা ছাড়া মানে হল অনুভূতিহীন, একটা কাষ্ঠ খন্ডের মত, যা সবায় বোঝে। তা হলে তার কোন সুখ শান্তি পাওয়ার সম্ভবনা যেমন থাকবে না তেমনি দুঃখ কষ্ট, ব্যাথা, বেদনা ও থাকবে না। পুরো ভবিষ্যতের জীবন অর্থহীন হবে। তাদের সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং কামিল সিদ্ধান্ত নিল, এই নবীকে অবশ্যই ‘ভবিষ্যতের এমন জীবন’ উপস্থাপন করতে হবে যা দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে হতে হবে।^{১৫}

এর পর কামিল ভাবল, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃতি কেমন করে এটা হবে?, সেটা অনেক চিন্তা করল এবং নিজে নিজেকে বলল যে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে মানুষ শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে তৈরী। শরীর এমন যা অনুভব ও স্পর্শ করা বা বুঝা যায়। কিন্তু আত্মা হল তাই যা, যখন কেউ “আমি” বলে যা বুঝতে চায়, তা। এ ক্ষেত্রে কেউ এটা বুঝতে চায়না, আমি মানে আমার দেহটি বা এর কোন অংশ। কারণ অবিশ্কাবী নিশ্চয়তার সাথে সবায় জানে যে, এটা সব সময় একই থাকে। শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত। অপরপক্ষে শরীর বা এর অংশগুলি এমন নয়। কারণ শিশু বয়সের কোন মানুষের শরীর, আর তার বৃদ্ধ বয়সের শরীর এক নয়, একই ভাবে শরীরের অন্য অংশগুলিও।

কারণ শরীর ও এর অংশগুলি অব্যাহতভাবে ক্ষয় ও গঠনের মধ্যে অলংঘনীয় ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু মানুষ যেটা বুঝায়, যখন সে বলে “আমি”, সেটা এরকম নয়। কারণ এটা অব্যাহত ভাবে একই থাকে।

^{১৫} এটা পুনরুত্থানের প্রশ্নে বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রতিউত্তর (আত্মিক বা দৈহিক)। মূলতঃ সে সময় এই প্রেক্ষাপটে এটা রচিত হয়েছিল।

আরেকটি যুক্তি কামিলের চিন্তায় আসল, তা হল মানুষ কখনও তার দেহ এবং এর অঙ্গগুলি, যেমন হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞান বা অচেতন হতে পারে তবে তার আত্মার প্রতি তার অজ্ঞান বা অচেতন হওয়া অসম্ভব। এটাই হল তা যা সে উল্লেখ করে যখন সে বলে ‘আমি’। অতএব আত্মাকে শরীর থেকে আলাদা কিছু হতে হবে। আর দেহ, কোনও সন্দেহ নেই, ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুগত এবং উপলব্ধি যোগ্য। তবে আত্মা সে রূপ নয়, তা নিখাদ শুদ্ধ জিনিস। এটি দুর্ঘটনা হবে, তা একেবারেই অসম্ভব। দেহ নিজেই নিজেকে ধারণ করে, আর দুর্ঘটনা হয় শুধুমাত্র বস্তুগত পদার্থ দ্বারা ও পদার্থের বেলায়। সুতরাং আত্মাকে একটি সারাংশ (جوهر essence) হতে হবে এবং এটি শরীর থেকে মুক্ত হতে হবে। অন্যথায় এটি একটি দেহ বা দেহের মধ্যে হবে। এবং যদি তাই হয় তবে এটিতে যা ঘটবে তার একটি অবস্থান এবং একটি রূপ থাকবে। তা ভাগ করা যেতে পারে। কারণ যা কিছু একটি দেহে বা একটি দেহের মধ্যে একটি অংশে ঘটে থাকে তা তার অধিন। মানুষের আত্মার মধ্যে যে জিনিসগুলি ঘটে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ধারণা এবং অনুভূতি। এখন যদি আত্মা একটি দেহ বা শারীরিক গুণাবলী ধারণ করে তবে অনুভূতি ও ধারণাগুলি ভাগ হয়ে যেত। তাহলে কোন একক অনুভূতি বলতে কিছুই থাকত না। যা একেবারে অসম্ভব।

কামিল চিন্তা করল, তাহলে, মানুষের আত্মা শরীর থেকে মুক্ত হতে হবে। যদি এটি হয় তবে এটির শরীরে মিশ্র পদার্থ হিসাবে অস্তিত্ব, যা থেকে মানুষের দেহ সৃষ্টি হয় তার সৃষ্টির আগেই এর উপস্থিতি থাকতে পারে না। কারণ যদি সেটির আগে এটি উপস্থিত থাকে তবে তা, না একক হতে পারে আবার না বহুধা বা সব সৃষ্টির জন্য হতে পারে। এবং সম্ভবত একেবারেই টিকে থাকতে পারে না। এটি বহুবিধ হতে পারেনা কারণ প্রতিটি প্রজাতি পৃথক। সুতরাং এটা এ বিষয়ে সৃষ্টির আগে বহুগুণের বা সব সৃষ্টির নয়।

কামিল ভাবল, এটি একক হতে পারে না। কারণ যদি একক হত তাহলে সব বহুবিধ সৃষ্টি যারা এর উপর নির্ভর করে তারা একক ও একক আত্মার রহত। অর্জিত গুণ ও ধারণাগুলি সবার এক হয়ে যেত, আর এটা পুরোপুরি অসম্ভব। এবং এটি অযৌক্তিক। সুতরাং মানুষের আত্মা অস্তিত্ব হতে হবে কেবলমাত্র মানুষের অস্তিত্বের পরেই, যে অস্তিত্ব যথায়ত ভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী উপাদানের মিশ্রণে সৃষ্ট হবে। সুতরাং মানুষের অস্তিত্বের উপস্থিত থাকা পূর্ব শর্ত মানুষের আত্মার অস্তিত্বের।

মানুষের অস্তিত্বের এই পদার্থটি শুক্রাণু এবং অনুরূপ জিনিস থেকে উৎপন্ন হয় এবং যখন আত্মা এর সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং তারপর এর উপর তার ‘প্রতিপালন’ ক্রিয়া শুরু করে এবং অঙ্গগুলি তৈরি করতে শুরু করে। তখন দেহ উৎপন্ন হয়। এই কার্যকর উপাদান (সারাংশ, nucleus, جوهر) কে ‘আযবা জানব’ বলা হয় ^{১৬}। এটি অবাস্তব যে এটি হারিয়ে যেতে পারে আর

^{১৬} হাদিসের ভাষায় الْعَدْبُ النَّبِيُّ، ‘লেজের মূল, যার অর্থ ‘মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের ক্ষুদ্র হাড়’ যা হাদিস অনুসারে (ভিন্নমত আছে) মানব দেহের সৃষ্টির, এর পুনরুত্থানের নিউক্লিয়াস (মূল কার্যকর উপাদান) হিসাবে মনে করা হয়, এবং শরীরের অন্যান্য অংশের সাথে সাধারণভাবে পচনের বিষয় নয়, অবিদ্যমান, (মুয়াত্তা ১৬:৪৮)।

আত্মা টিকে থাকবে। এটির ক্ষয় হবে না যতক্ষণ আত্মা টিকে থাকে। কারণ তাছাড়া আত্মা নিজের অস্তিত্বের জন্য এটার উপর নির্ভরহীন হত। এবং এটার অস্তিত্ব তার উপর নির্ভর করত না। এটি একটি দ্বন্দ্ব। সুতরাং যতক্ষণ না মানুষের আত্মা টিকে থাকবে ততক্ষণ এই সারাংশ বিনষ্ট হওয়া উচিত হবে না।

মানুষের আত্মা অবিনাশী। কারণ যা বিনাশযোগ্য তা একটা পদার্থ। এর মধ্যে আত্মা কখনও টিকে থাকতে পারে আবার কখনও অনুপস্থিত থাকতে পারে। কামিল সিদ্ধান্ত নিল, মানুষের আত্মার যেহেতু পদার্থ নয় সুতরাং এটা অবিনাশী। এই সারাংশ (جوهر), তাও অবিনাশী। সুতরাং কামিল ভাবল, এটি দেহের মৃত্যুর ও ক্ষয় হওয়ার পরে থেকে যাবে। আত্মা এর সাথে থেকে যাবে ও এটাকে অনুধাবন এবং লক্ষ্য করার কাজ অব্যাহত রাখবে এবং সে সময়ও, এটা আনন্দ বা বেদনা অনুভব করে থাকবে। এগুলি হয়ে থাকবে সমাধির আনন্দ এবং বেদনা ^{১৭}।

অতঃপর যখন পুনরুত্থানের সময় আসবে, তখন আত্মা আবার 'উদ্দীপনা' সৃষ্টি করবে এবং মূলের এর সাথে অন্য বিষয়কে আকর্ষণ করবে এবং এর অনুরূপ কিছুতে রূপান্তর করবে এবং তার থেকে দ্বিতীয়বার একটি দেহ পাবে। এই দেহটি হল প্রথম দেহের মতো কারণ এটির মূল পদার্থ একই এবং আত্মাও একই। কামিল বঝতে পারল, এইভাবে পুনরুত্থান ঘটবে। এর পরে আত্মা কখনই দেহকে উদ্ভিষ্ট বা পোষণ করা বন্ধ করে না। ফলে দেহ আর কখনও অস্তিত্বহীন হবে না। হক তা সুখে (স্বর্গে) বা দুঃখে (নরকে)। কামিল ভাবল, যতবারই নরকের আগুন এই দেহের নতুন সৃষ্ট অংশগুলিকে পোড়াবে, আত্মা আবার উৎপন্ন করবে।

এই দেহগুলি চারদিকে (অবিনাশী মূল) পদার্থকে ঘিরে ধরে এবং তাই তাকে 'চামড়া' বলা হয়। এই চামড়াগুলি নরকে থাকার সময় পুড়বে আবার একে অপরকে প্রতিস্থাপন করে থাকবে।^{১৮}

^{১৭} এটি কল্পনা মাত্র, fiction, কামিলের যুক্তিবিন্যাস ও ভাবনা। হাদিস মুয়াতা (১৬:৫১) এর পরোক্ষ উল্লেখ। অতি-প্রাকৃতিক বিষয়ের প্রাকৃতিক বা বস্তুগত ব্যাখ্যা চলে না। অধ্যায়ের শুরুতেই লেখক কামিলকে দিয়ে তা উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষ ও নব্য-রোমান বস্তুবাদী দার্শনিকদের প্রতিবাদে যুক্তির অবতারণা করেছেন যে, যুক্তি দিয়েও ধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তবে অপ্রাকৃতিক বিষয়ে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়, যুক্তিযুক্ত নয় বলেই দেওয়া হয় না। আল্লাহ ভাল জানেন - অনুবাদক।

^{১৮} আল-কোরআনের (৪:৫৬), (২২:২০) পরোক্ষ উল্লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাস্তবিক বাধ্যবাধকতা যা নবী(স) আরোপ করেছেন।

প্রথম বিভাগ: এই নবী(স) নির্দেশিত ইবাদত সম্পর্কিত কর্তব্য সম্পর্কে।

কামিল যখন প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছল, তখন সে চিন্তা করল যে, এই নবী(স) সর্বশেষ নবী হিসাবে, শেষ অবধি তাঁর মতবাদটির স্মরণীয় করে রাখার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁর নিশ্চিত করা উচিত হবে যে তাঁর মতবাদটি প্রায়শই মনে রাখতে হবে, এই স্মরণটি প্রত্যক্ষভাবে বা কোন জিনিসের সাথে সংযুক্তিতে নির্ধারিত হওয়া নিশ্চিত করা উচিত এবং যদি সরাসরি হয়, তবে স্বাধীনভাবে বা দায়িত্ব পালন হিসাবে - এবাদতের অংশ হিসাবে। এই বিভিন্ন ধরণের স্মরণ করার উদাহরণ হল রোজা, যাকাত - কর, আচার-অনুষ্ঠান ও হজ্জ এবং ধর্মীয় পেশা বা প্রচার। সে আরও ভাবল নবীর ধর্মীয় ব্যবস্থাটি পাঁচটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে করা উচিত হবে, যেমন, কেবলমাত্র শব্দের উপর নির্ভর করে, যেমন ধর্মীয় পেশা ও প্রচার, অথবা কেবল দেহের ক্রিয়া, যেমন আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা। শারীরিক উপস্থিতি যেমন রোযা, বা যাকাত-কর হিসাবে আর্থিক বাধ্যবাধকতা, বা হজ্জের সফরের যৌথ শারীরিক ও আর্থিক বাধ্যবাধকতা। এ

সবের মধ্যে কিছু বাধ্যবাধকতা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং তা কেবলমাত্র জীবনে একবারের জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। অন্যগুলি সম্পাদন করা খুব সহজ এবং তাই প্রতিদিন বেশ কয়েকবার পরিপূর্ণ হতে পারে যেমন ইবাদত। এ কারণেই মানুষকে আল্লাহ এবং তাঁর নবীকে(স) আরও সরাসরি স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যগুলি রোজা এবং যাকাত-করের মতো যা – উভয় চরমের মাঝামাঝি এবং তাই বছরে একবার নির্ধারিত হবে। তবে ধর্মীয় পেশার বিষয় হল বিশ্বাস স্বয়ং। এবং বিশ্বাস অবশ্যই স্থায়ী হতে হবে। পেশা বা প্রচারের কাজও স্থায়ী হতে হবে।

দ্বিতীয় বিভাগ: লেনদেনের বিষয়ে যা এই নবী(স) নির্ধারণ করেন।

কামিল চিন্তা ভাবনা করল, এই সমাজ এবং মানবজাতির মিলন আসতে পারে কেবল যদি তাদের লেনদেন ন্যায়সঙ্গত হয়। যদি কারও ক্ষতি না হয়, এবং যদি এমন কিছু অনুমোদিত না হয় যা সাধারণ প্রয়োজনকে বা সন্তুষ্টিকে অবহেলার দিকে পরিচালিত করে, অলসার সাথে। কারণ মানব সমাজের প্রত্যেককে অসুস্থতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত সমাজে অবশ্যই একটি দরকারী অংশ ভূমিকা পালন করতে হবে।

সুতরাং পৃথকভাবে সম্প্রদায়ের লোকদের কার্যকর মিলনে হতে বাধা দেয় এমন সমস্ত কিছুকে যেমন সুদ, তুচ্ছতা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা উচিত হবে, এগুলি সবই কার্যকর কাজের উৎপাদনশীলতা বাতিল করে দেয়। কামিল আরও ভাবল বিতর্ক এড়ানোর জন্য সমাজের লোকদের কোনও কার্যকরী উপায় দেখাতে হবে। তা কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস হস্তান্তর সম্পর্কেই হোক, যেমন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে। অথবা পছন্দ অনুসারে বিক্রয় বা ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে বা ওয়াকফের ক্ষেত্রে বা দরকারী জিনিস স্থায়ীভাবে স্থাপনের বিষয়ে হোক। অথবা দরকারী সামগ্রীর অধিকার ত্যাগের বিষয়ে, যেমন ক্রীতদাসস্বমোচন ক্ষেত্রে হোক। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শেষ নবীর (স) একটি ন্যায়বিচার পদ্ধতি স্থাপন করা হয়ে থাকবে। স্ত্রীদের চেয়ে পুরুষদের উত্তরাধিকারে অংশ বেশী দেওয়া তার উচিত হবে, কারণ যদিও তারা আরও সহজেই উপার্জন করতে সক্ষম হয়। পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের জন্য লালন পালনের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়: নবী(স) এর গার্হস্থ্য অর্থনীতি (তদবীর আল-মঞ্জিল) এবং স্ত্রী, দাস এবং আত্মীয় স্বজনদের জন্য বিধানের বিষয়ে যে বিধিগুলি প্রবর্তন করতে হবে তার উপর।

অতঃপর কামিল চিন্তা করল, যেহেতু অনেকগুলি মানুষের এক জায়গায় বসবাস ^{১৮}, আর স্বতঃস্ফূর্ত প্রজন্ম কেবল ব্যতিক্রম দ্বারাই ঘটতে পারে, তাই মানুষের প্রজন্ম রক্ষা করার জন্য যৌন মিলন জরুরি। সুতরাং এই শেষ নবীর(স) এর উচিত হবে এটি উৎসাহিত করা, কিন্তু এমন এক উপায়ে যা অসংখ্য বংশের গ্যারান্টি দেয়। সুতরাং তার উচিত হবে পুরুষ ও স্ত্রী সমকামিতা নিষিদ্ধ করা। সাধারণ সহবাস এমনভাবে হওয়া উচিত যা পিতৃস্ব সম্পর্কে কোনও সন্দেহ রাখবে না; সুতরাং নবীর(স) উচিত হবে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করা। যদিও ব্যভিচার বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে, তবে এর ফলস্বরূপ যাদের উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত নয় তারা উত্তরাধিকারী হবে এবং যাদের অধিকার রয়েছে তারা উত্তরাধিকার থেকে বিরত থাকবে। অতএব, তাঁর (স) বিবাহকে জনসাধারণের চুক্তিতে পরিণত করা উচিত, যাতে পিতৃস্ব কোনও সন্দেহ না থাকে; এবং এটি সাক্ষীদের উপস্থিতির মাধ্যমে করতে হবে।

যেহেতু বহুপতি গ্রহণ পিতৃস্বের অনিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করে, নবীর(স) উচিত হবে এটি নিষিদ্ধ করা। তবে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা যাবে না। একজন পুরুষ এবং স্ত্রী একসাথে জীবনকে হিসাবে খুঁজে পেতে পারে অসম্ভব করে, তাই বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকা উচিত, বিশেষত নারী-পুরুষের গঠন ও মেজাজগুলি এমনভাবে পৃথক হতে পারে যে তাদের মিলন থেকে কোনও সন্তান নাও হতে পারে। অপর দিকে এটি ভালও হতে পারে, যদি তাদের একজন অন্য একজনের সাথে বিবাহিত হয়। তবে বিচ্ছেদ উচ্চারণ করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত

^{১৮}উল্লেখ্য যে কামিল মানব সমাজকে অন্য একটি জনবহুল দ্বীপে দেখেছে।

অধিক যুক্তিসঙ্গত অংশীদারকে, যে বিবাহের মাধ্যমে আর্থিক বাধ্যবাধকতা বহন করে এবং সে ব্যক্তি ‘পুরুষ’। তবে স্ত্রীর নিজের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করা উচিত হবে না। উদাহরণতঃ, যদি স্বামী তার জন্য ব্যয় ভার বহন করতে অক্ষম হন। যেহেতু পুরুষেরা উপার্জন করতে সক্ষম, এবং মহিলারা গৃহ পরিচালনার বেশী উপযুক্ত। পুরুষের উচিত স্ত্রী ব্যয় বহন করা এবং স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা।

ক্রীতদাস তাদের মালিকের তত্ত্বাবধায়নে থাকে, যারা তাদের ব্যয়ভার বহন করে। মালিকদের তাদের দক্ষতার ভিত্তিতে তাদের সেবা দাবি করার অধিকার থাকা উচিত। ধনী আত্মীয়দের উচিত অভাবী স্বজনদের ভার বহন করা।

চতুর্থ অধ্যায়: নবী যে শাস্তি প্রবর্তন করবেন সে সম্পর্কে।

কামিল চিন্তিত হল যে, যেহেতু কিছু পুরুষ দুষ্টতার দিকে ঝুঁকে এবং তারা কেবল জ্ঞান দ্বারা সংযত নয়, যে ধর্মীয় আইন যা কিছু নিষিদ্ধ করেছে তা মেনে চলবে। তবে প্রত্যেকে কেবলমাত্র মেনে চলবে, ‘একটি প্রধান শক্তি’, যেমন রাজা। এদ্বারা এ প্রবনতা প্রতিরোধ করা যায়,। তাই প্রতিটি শহরেই একজন রাজা বা তার প্রতিনিধি থাকতে হবে। তবে রাজাদের তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না যেহেতু তারা প্রায়শই অত্যাচারের দিকে ঝুঁকবে। সুতরাং তাদের উপরেও একজন শাসক থাকা উচিত, যে তাদেরকেও শাসন করবে, তাকে খলিফা বলা হবে।

রাসূলের(স) উচিত হবে, যা আত্মার, বস্তু-সামগ্রীর এবং বুদ্ধিমত্তার জন্য খারাপ অবস্থার কারণ হতে পারে তা নিষেধ করা। সুতরাং তার(স) হত্যা, চুরি, দখল, এবং মাতাল হওয়া নিষেধ করা উচিত। প্রত্যেকটি এবং অন্যান্য অপরাধের থেকে, জনগণকে থেকে বিরত রাখতে একটি শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য তাঁকে(স) প্রতিশোধ নিতে হবে। তবে দুর্ঘটনাক্রমে গণহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া অনিয়মিত হবে। তবে এটিকে সম্পূর্ণ শাস্তি ছাড়াই যেতে দেওয়ার অর্থ দাঁড়াবে যে দায়বিহীন রক্তপাত বয়ে যেতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাকে রক্তের বিনিময়ে অর্থের মতো কিছু বিধান দিতে হবে। চুরির জন্য নির্দেশিত শাস্তি হাত কেটে দেওয়ার মতো কিছু হতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক দুষ্কর্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি স্থির করা উচিত। ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের পাশাপাশি মদ পান করার জন্যও শাস্তির বিধান করতে হবে। কারণ মাতালমি বিবেককে রুদ্ধ করে এবং এটি দুর্ভাগ্যের উৎস। তদুপরি, তাঁর(স) উচিত ধর্মের সুনাম বাড়াতে এবং তাঁর(স) প্রতিপক্ষদের তাদের বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারে একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত হবে। যারা তাঁর ঐশ্বরিক আইনটির তীব্র বিরোধী তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া উচিত। তবে যারা সত্যের নিকটবর্তী ও প্রবল বিরোধী নয় তাদের কেবল ট্যাক্স দিতে বাধ্য করা উচিত। কাফেরদের কাছ থেকে নেওয়া এই শুল্ক, বিশ্বাসীদের কাছ থেকে নেওয়া কর যারা সমাজের জন্য উপকারী যেমন, দেশ রক্ষাকারী সৈন্যদের সরবরাহ, ইমাম এবং মুয়াজ্জিন, , গরীব-দরিদ্রদের এবং ভ্রমণকারীদের ইত্যাদির জন্য।

চতুর্থ অংশ

কামিল শেষ নবী (স) এর ইনতেকালের পরে ঘটতে যাওয়া ঘটনাগুলি জানতে পেরেছিল কীভাবে ?

প্রথম অধ্যায়: কামিল কীভাবে তাঁর মৃত্যুর পরে এই নবীর(স) সাহাবীদের মধ্যে খেলাফতের সংগ্রাম জানতে পেরেছিল।

ফজল বিন নাতিক বলল, কামিল ধ্যান-চিন্তা করল, নবী (স) জীবনের উপর, তাঁর প্রবর্তিত বিধানের উপর। সে ভাবল শেষ নবী(স), তাঁর ইনতেকালের পর তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে কি ভাবে পারেন। কামিল নিজে নিজেকে বলল,

শেষ নবী(স) যেহেতু তার মিশন শুরু করেছিলেন চল্লিশ বছরের পর ৩৩ ইনতেকাল করেছিলেন, কিছু বেশি ষাট বৎসর বয়সে। তার বার্তা সব মানুষের কাছে তখনও পৌঁছতে পারে নাই। যেহেতু তাঁর পরে আর কোনও নবী আসতে পারে না, তাই তাঁর ধর্মের দাওয়াত সমস্ত মানবজাতির কাছে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই তাঁর পরে একজন উত্তরাধিকারী (খলিফা) হওয়া উচিত। তাঁর ধর্মকে রক্ষার জন্য সর্বদা এটি চালু হওয়া উচিত। এই খলিফাকে অবশ্যই জনগণের শ্রদ্ধা করা উচিত। খলিফা তাঁর নবীর(স) মৃত্যুর পরের সময়কালে তাঁর সাহাবীদের(রা) মধ্যে থেকে আসা উচিত। যদি নবী(স) নিজে তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে যে কোনও এক ব্যক্তিকে তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে মনোনীত করেন, তবে এটি তাঁর(স) অন্যান্যদের মধ্যে হিংসা জন্মাতে পারবে এবং এই খলিফার ক্রটির জন্য তাকে দায়ী করা যেতে পারে। সুতরাং সেই শেষ নবী(স) স্পষ্টভাবে কাউকে মনোনীত করতে পারেন না।

পুরুষদের যেহেতু ক্ষমতার প্রতি ভালবাসার থাকে, অবশ্যই সেখানে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকবে। এমন কি যুদ্ধ পর্যন্ত হতে পারে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে খিলাফতের জন্য। তবে তার মৃত্যুর অবিলম্ব পরে তা হবার নয়। কারণ এটা কাফেরদের বিজয় এবং ধর্মীয় আইন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারত। তবে আরও কিছু সময় পরে। যখন তখনও উপযুক্ত প্রার্থী থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কামিল কীভাবে এই নবীর (স) মৃত্যুর পরে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল।

এটি অনিবার্য ছিল যে খিলাফতের প্রত্যেক দাবীকারীর চারপাশে লোকেরা দলাদলিতে জড়িয়ে পড়বে। যারা উগ্রভাবে উৎসাহী, পক্ষপাতদুষ্ট এবং তার প্রতিপক্ষের বিরোধী বা কারও আনুকূল্য পাওয়ার জন্য। এতে বহু দল ও লড়াই-দ্বন্দ্ব দাড়াবে। সুতরাং এই বিরোধ – বিদ্রোহের সময়ে নবীর(স) নির্দেশ ও বিধান মানুষের সমূহ মনে রাখার জন্য আইনের সংরক্ষণ ও বিস্তারিত বিধান তৈরী করতে হয়ে থাকবে। যা করা যেতে পারে তাঁর(স) জাতীর শিক্ষিতদের (আলেম) দ্বারা। যাদের জ্ঞান নবীদের(আ) মত নাজিল হয়নি, বরং তা তাদের চিন্তাভাবনা এবং ব্যক্তিগত মতামত।

মানুষের স্বভাব যেমন আলাদা, তাই এই নবীর(স) ধর্মীয় সম্পর্কে বহু মতামতের উত্থান হবে অবশ্যই এবং প্রত্যেককেই তার স্ব স্ব মতামত, তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। সুতরাং এই নবীর(স) সম্প্রদায় বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে থাকবে হবে। তারা সেসব নীতি ও বিবরণের ভিত্তিতে মতভেদ করে থাকবে। একে অপরের সাথে বৈরী হবে। অনুসারী পাওয়ার জন্য প্রতি অংশের প্রধান (ইমাম) কে অনেক বই রচনা করতে হবে। তাঁর অনুসারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) ও বস্তুগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

যেহেতু এই নবী(স) নবীদের সর্বশেষ ছিলেন, তাই তাঁর বাণী এবং তাঁর কাজগুলি এবং তাঁর পবিত্র গ্রন্থটি ও তার ব্যাখ্যা সংরক্ষণ করার জন্য মনোযোগ দিতে হবে। সুতরাং হাদিসে বিজ্ঞান এবং ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের ও অন্যান্য ধর্মীয় বিশেষ বিজ্ঞানের প্রয়োজন হবে। এবং এতে নবীর(স) মৃত্যুর পরে বেশ কিছু সময় প্রচুর বই রচনার প্রয়োজন হয়ে থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়: কামিল কীভাবে জানল এই নবীর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অপরাধ সংঘটিত হতে হয়েছিল।

এরপর কামিল ভাবল নবী(স) মদ পান করা এবং অপরিচ্ছিতদের উপস্থিতিতে জনসমক্ষে মহিলাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। আগ্রহ একটি মহৎ এবং প্রশংসনীয় গুণ, তবে এর দুটি অনিবার্য পরিণতি ছিল। প্রথমত, মদ

নিষিদ্ধকরণ অমান্য করা। কারণ মানুষের প্রবৃত্তি দৃঢ়ভাবে এটি চায়। স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং বহু রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিকার হিসাবে এটি অপরিহার্য নয়।

দ্বিতীয়ত, তাঁর(স) সম্প্রদায়ের মধ্যে সমকামিতার বৃদ্ধি। কারণ অনেক লোক মোটেই বিয়ে করতে পারবে না বা ভ্রমণ করার সময় তাদের স্ত্রীদের সাথে নিতে পারবে না।

চতুর্থ অধ্যায়: কামিল কি ভাবে জানতে পেরেছিল যে তাদের পাপের কারণে শাস্তি এই নবীর(স) সম্প্রদায়ের উপর পড়েছিল।

কামিল চিন্তা করল এবং নিজকে বলল, এই পাপগুলিকে শাস্তি দেওয়া অবশ্যস্বাভাবিক হবে। যাতে মানুষেরা এই নবীর(স) বিধান, ব্যবস্থাপত্রকে লঙ্ঘন করা হালকাভাবে চিন্তা না করে এবং তওবা করে বাদ দেয়।

শাস্তি কোনও বিপর্যয় সৃষ্টিকর হবে না, যেমন পৃথিবী দ্বারা গ্রাস করা বা জলস্রোতের দ্বারা ধ্বংস হওয়া। যার লক্ষণ এই সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর ক্রোধের প্রকাশ। কিন্তু এই শেষ নবী(স) মর্যাদার সাথে এরূপ শাস্তি অসামঞ্জস্য পূর্ণ।

সুতরাং শাস্তি শুধু মাত্র রক্ত পাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এটা করতে হবে কাফিরদের আক্রমণের দ্বারা। এটা হবে সমাজের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক শত্রুতায় নিজেরা ব্যস্ত থাকায়। যেহেতু তারা ধৈর্য বা সমাজ পুনর্গঠনে মনোযোগী ও উৎসাহিত থাকবে না। একই সময়ে পাশাপাশি বহিরাগত কাফিরদের সেই আক্রমণের সময়, যারা বিশ্বাসী তারা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিবে ও আক্রমণে বাধা দিবে। আর তাদের একটা সুযোগ হবে কাফিরদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যোগ্যতা অর্জনের।

পঞ্চম ধারা: কামিল কীভাবে কাফিরদের এই সম্প্রদায়কে শাস্তির বিষয়টি জানতে পেরেছিল।

কামিল ভাবল, এই কাফিররা নবীজির(স) এর নিজ ধর্মীয় কোন দেশের হওয়া উচিত হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে তাদের কৃতকার্যতা সে ধর্মের উপর পড়বে। তা এই শাস্তির লক্ষ্যের বিপরীতে হবে। শর্ত পূরণ হবেনা যদি শেষ নবী (স) এর বানী এই কাফিরদের কাছে না পৌঁছে। অন্য কথায় তারা যদি দুনিয়ার এমন যায়গার অধিবাসী হবে যেখানে তাঁর (স) ধর্মীয় সন্ত্যতা পৌঁছে নাই।

তারা পৃথিবীর শেষ দক্ষিণ অংশে বাস করতে পারে না, তারা দুর্বল হৃদয়ের লোক, বেশী উষ্ণ এলাকা বলে। সুতরাং তারা যোগ্য হবে না কোন জাতির রক্ত ঝড়তে। অতএব তাদের উত্তরাঞ্চল থেকে আসতে হবে। কারণ ঐদিকের লোকেরা আবহাওয়া ঠান্ডার কারণে সাহসী, কঠোর হৃদয় ও নির্দয়। তারা উত্তর – পশ্চিম দিক থেকেও হতে পারে না, তারা সংখ্যায় অল্প ও বিভিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। সমুদ্র দিয়ে বিভক্ত। তাদের এ সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় একত্রিত হওয়া কঠিন। কাফিরদের অবশ্যই সমভূমি দিয়ে আসতে হবে কারণ শহরের অধিবাসীরা কম সাহসী। তাদের অবশ্যই প্রশস্ত বুক, বড় মাথা, সরু পা, ছোট চোখ ও প্রশস্ত পশ্চাৎদেশ হবে। তাদের বাহু অবশ্যই বড় কারণ ঠান্ডা আবহাওয়ার অধিবাসী হওয়ায় তাদের শরীরে উত্তাপ বেশী। তাদের পাগুলিও অবশ্যই সরু কারণ, এটা সাহসীদের যোগ্যতার নিদর্শন, যেমন সিংহের বেলায় দেখা যায়। শত্রুদের চোখ ছোট, সংকীর্ণ, তাদের মাথার অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ রয়েছে, ঠান্ডা আবহাওয়ায় যা বিদূরিত হয়নি। আর একই কারণে তাদের নাকগুলি চেপ্টা। তাদের বড় পশ্চাৎদেশের কারণ হল, তারা ছোটকাল থেকেই ঘোড়ায় চড়ে। যেহেতু সে এলাকায় প্রচুর ঘোড়া পাওয়া যায়। তারা ঘোড়ার পিঠ পরিবহনে ব্যবহার করে ^{১৯}।

^{১৯} লেখক স্পষ্টতই মঙ্গলদের কথা বর্ণনা করেছেন।

এই কাফিরা সম্পূর্ণ ইসলামী সাম্রাজ্য দখল করতে পারবে না, কারণ এতে এই ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে, অল্প কিছু দেশ দখল করবে, বিশেষতঃ উল্লেখিত পাপগুলি যে সমস্ত দেশে হয়ে ছিল। এ সমস্ত দেশগুলি তাদের নিকটবর্তী। কাফিররা দেশ দখল করার পর ধর্মের কোন পরিবর্তনের চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ তাদের নিজস্ব কোনও ধর্ম নেই। বিপরীতে, তাদের এই ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়া উচিত হবে। তাদের এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত হবে। ফলে কাফিরদের নিজেদের দেশই শুধু নয়, অন্য যে সমস্ত দেশ তারা জয় করবে সে গুলিও এই ধর্মের মধ্য আসা উচিত হবে। সুতরাং নবীজি(স) এর এই ধর্মের সামরিক শক্তি ছাড়াই বিস্তার লাভ করা উচিত হয়ে থাকবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: কামিল কীভাবে পূর্বের অবস্থার বিষয়টি জানতে পেরেছিল, যেসব দেশগুলি কাফেররা জয় করতে পারেনি।

কামিল নিজে নিজে বলল, যেহেতু যে দেশগুলি কাফিররা দখল করেছে তা দূরে অবস্থিত ও কাফিরদের সীমান্তে হলেও, যারা তাদের ধর্মীয় প্রতিবেশী ছিল, নিজেদের রক্ষার্থে এদের কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করার প্রয়োজন হবে। এতে দুটি জিনিষের দরকার হবে :প্রথমতঃ বড় সেনাবাহিনী এবং দ্বিতীয়তঃ এক জন সাহসী সুলতান। এগুলি শক্তিশালী শত্রু ও বড় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আবশ্যিকীয় পূর্ব শর্ত যুদ্ধে জয়লাভের, । পূর্বে এই ধর্মীয় দেশের লোকেরা বড় সেনাবাহিনীর প্রয়োজন অনুভব করে নাই। সুতরাং এ সমস্ত সীমান্ত দেশগুলি আগের থেকে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলে থাকবে।

এতে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেহেতু স্বাভাবিক অর্থ-সংগ্রহে এ ব্যয় বহন করা যায়না, সেহেতু বাড়তি অর্থ জোড় করে এর অধিবাসীদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। এটা সম্ভবত শুধু সুলতানকে স্পষ্টভাবে মানা হলে সম্ভব হবে। যেহেতু স্বেচ্ছায় কেউ এগিয়ে আসবে না।

এই অর্থ আদায় দেশ রক্ষার কাজে লাগবে। এছাড়াও অধিবাসীদের পবিত্র হওয়ারও প্রয়োজন। আবার তাদের পাপসমূহ এত বেশী না যে তাদের জীবন দিতে হবে। তাদের কিছু সম্পদ থেকে বঞ্চিত করলেই যথেষ্ট হবে। এর একটা ফলাফল ও আছে। তা হল দেশ দরিদ্র হবে, গরীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, জিবিকা দুর্লভ হবে। ফলে পরিনতিতে চুরি বৃদ্ধি পাবে এবং খারাপ দেশে পরিণত হবে।

সপ্তম অধ্যায় : কামিল কীভাবে দেশের সুলতানের অবস্থা জানতে পেরেছিল যারা এই সম্প্রদায়ের সুরক্ষা দিয়ে এই কাফেরদের সাম্রাজ্যকে সংযুক্ত করবে।

কামিল গভীর ভাবে ভাবল, এই সুলতানকে অবশ্যই অবশ্যই তার দেশ, তার সেনাবাহিনী এবং তার উপায়,উপকরণে কাফেরদের তুলনায় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হতে হবে, কারণ কাফেররা এই নবীর(স) সম্প্রদায়ের অধিকতর অঞ্চল দখল করেছে এবং অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণও করেছে,অন্যান্য দেশের উপর। এই সুলতান যুদ্ধে পুরো সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে , একত্র করার মতো সাহসী না হলে তিনি কাফেরদের তাদের দেশ দখল করতে বাধা দিতে পারবে না। সুতরাং তাকে অবশ্যই খুব সাহসী হতে হবে,। তাঁর লোকদের দ্বারা সাহসী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। যদি বীরত্বপূর্ণ কাজগুলি তাঁর পরিচিত হয় তবে এটি হবে। তাকে অবশ্যই দূঢ়চেতা, এবং নির্ভুর ও নির্দয় হতে হবে। সুতরাং তাকে অনেকগুলি শাস্তির আদেশ দিতে হবে যেমন অঙ্গ কেটে ফেলা, ক্রুশবিদ্ধ করা এবং পেরেক পুঁতা^{২০}। এই অনুসারে , চুরি ও অন্যান্য অপরাধে

^{২০} এই বর্ণনাটি মিশর রাজা বেয়বার্গের অধীনে মিশর ও সিরিয়ার অবস্থার সাথে খাপ খায়।

এ জাতীয় শাস্তি যা দেশে প্রচলিত রয়েছে তা প্রয়োগ করা। অতএব এই সুলতান নগরবাসী থেকে আসতে পারে না যারা এইরকম শক্ত চরিত্র পান নি। তবে উন্মুক্ত দেশের লোকদের কাছ থেকে হতে পারে। সুতরাং তাকে অবশ্যই উত্তর এবং বিশেষত উত্তর-পূর্ব দিকের হতে হবে, কারণ উত্তর-পশ্চিমের মানুষ দুর্বল এবং তাদের চরিত্রটি কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীর সাথে এক নয়। একই কারণে সুলতানকে অবশ্যই সেই কাফেরদের দেশ থেকে বা তাদের কাছের কোনও দেশ থেকে আসতে হবে। অতএব তার অবশ্যই সরু চোখ, একটি প্রশস্ত বুক, একটি বড় খুলি, প্রশস্ত কাঁধ, সরু পায়ের হবে। খুব বেশী কাল চোখের এবং খুব সরু নাকের হবে না। তার শরীর অবশ্যই খুব বড় হবে না। কারণ এই ক্ষেত্রে তার প্রফুল্লতা ও তার হৃদয়ের উতাপ তার চরিত্রের সাথে প্রসারিত হবে। আর তার হৃদয় ও চরিত্রের উতাপের সাথে খাপ খাবে না। তাঁর শরীরও খুব ছোট হতে পারে না, কারণ তাতে তার দুর্বল সংকল্প হবে এবং দৃঢ় সংকল্প হবে না। তিনি দেশ শাসন ও কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যোগ্য হবেন। তার মেজাজটি উতাপের দিকে ঝুঁকতে হবে। অন্যথায় তিনি খুব সাহসী হতে পারেন না। তার বর্ণ অবশ্যই বাদামী-লাল হতে হবে। তার চুল খুব দুর্লভ নয়, বরং, পুরু। তার টাক পড়তে পারে না যদি না তিনি এমন কোনও ওষুধ ব্যবহার না করেন। যা এটির কারণ হয়। কারণ তিনি খুব শীতল দেশ থেকে এসেছেন। তার শরীর অবশ্যই সুঠাম এবং শক্ত হতে হবে। তার মেজাজের উতাপের কারণে, তাঁর দেহে উষ্ণিত বাষ্পগুলি সহজে দ্রবীভূত হয় না। অতএব তিনি অবশ্যই কঠোর চরিত্রের হতে হবে। একটি দুষ্ট এবং হুমকিপূর্ণ নয়। তিনি অবশ্যই খুব দ্রুত চলাফেরা করবেন। বিশ্রামকে ঘৃণা করবেন। বিশেষত রোদে অবশ্যই ঘামতে, শীতকে ঘৃণা করতে এবং অনেকগুলি আবরণে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পছন্দ করবেন। যদিও ঠান্ডা বাতাস শ্বাস নিতে পছন্দনীয়। অবশ্যই তার ঠান্ডা এবং ভারী খাবার পছন্দ করা উচিত। শীতকালে এবং শীতল জায়গায় ঘুমানোর সময় খুব গরম খাবারগুলি খেতে ঘৃণা করা উচিত। নিজেকে ভারী আবরণে আবৃত করতে পছন্দ করা উচিত। তবে তার পা শীতল বাতাসে প্রকাশ করতে হবে। তিনি অবশ্যই চোখের পলক খুব কমই ফেলবেন এবং তার পিঠে চুল থাকবে না, বরং খুব কম হওয়া সত্ত্বেও তার বুক এবং পেটে চুল থাকবে। তার ঘুম খুব গভীর বা দীর্ঘ হতে পারে না। তিনি প্রায়শই ঘুম থেকে হুড়োহুড়ি করে উঠবেন। প্রায়শই ভীতিজনক স্বপ্ন দেখে থাকবেন। খাবারের জন্য তার ক্ষুধা খুব শক্ত হবে না এবং তার যৌন মিলন খুব ঘন ঘন হবে না। তাঁর বেশিরভাগ সন্তান পুত্র হবে। তিনি বেশিরভাগই টক জাতীয় খাবার উপভোগ করবেন এবং কখনও কখনও মিষ্টি পছন্দ করবেন তবে স্বাদযুক্ত খাবারের প্রতি খুব বেশি ঝুঁকবেন না। তিনি ফল পছন্দ করবেন। তিনি ঘন ঘন বমি বমি ভাবের সাথে জড়িত হবেন এবং তাতে নিজেকে পরিষ্কার করা সহজ হবে।

অষ্টম অধ্যায় : কিভাবে কামিল রাজার সহকারীদের (কাফেরদের সীমান্তে) এবং তাঁর সহায়তাকারী এবং প্রতিবেশীদের অবস্থা, যারা নবী(স)এর অনুসারী, তাদের কথা জানল ?

কামিল ভাবল যেহেতু বাদশাহকে অবশ্যই তার যোগ্যতা, প্রবণতা এবং শক্তির জন্য তাঁর লোকদের মধ্যে বিখ্যাত হতে হবে। অবশ্যই তাদের ভয় ও ভীতিতে রাখতে হবে। তাদের অবশ্যই তাঁর আদেশ মেনে থাকতে হবে। অতএব তাকে অবশ্যই বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে সর্বোত্তম সম্ভাব্য পদ্ধতিতে আচরণ করে থাকবে। এই রাজা অন্যান্য রাজাদের থেকে পৃথক। তিনি এই কাফেরদের সাথে লড়াই করতে ব্যস্ত থাকবেন। তাঁর শক্তির দ্বারা তাদের মুক্ত করতে এবং যারা তাঁর নাগালের মধ্যে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাকে প্রায়শই তাদের দেশে চলে যেতে হবে। এটি তার রাজধানী থেকে অনেক অনুপস্থিত থাকার প্রয়োজন হয়ে থাকবে; অতএব তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য তাঁর একজন ব্যক্তির প্রয়োজন। তাঁর স্থলাভিষিক্তও অবশ্যই খুব সাহসী এবং সুশাসনের বিষয়ে আগ্রহী হতে হবে। তাকে প্রায়শই নিজেকেই দেশ পরিচালনা করতে হয়ে থাকবে। সুতরাং তাকেও অবশ্যই প্রভাবশালী ও কঠোর হয়ে থাকতে হবে এবং রাজার আনুগত্য লাভ করতে হবে। তাকে অবশ্যই ধর্মীয় বিধিগুলির খুব কাছাকাছি থাকতে হবে এবং সেজন্য অবশ্যই সে সম্পর্কে জ্ঞানবান হতে হবে, যাতে কাফেররা তার দেশে সীমালঙ্ঘন না করে। হত্যাকাণ্ড ও পরাজয়ের

দিকে পরিচালিত করতে না পারে। এই মন্ত্রীদের অবশ্যই ধর্মীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেনাবাহিনীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কর আদায় করে থাকবে। তা যেন অধিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে না পারে। সুতরাং তাকে অবশ্যই ভারসাম্যযুক্ত চরিত্রের হতে। বোধশক্তি ও শক্তি হিসাবে ততোধিক স্পষ্টতা এবং মমত্ববোধ থাকবে হবে। তিনি অবশ্যই আল্লাহর, এই সুলতানের, প্রজাদের এবং সেনাবাহিনীর আত্মবিশ্বাস উপভোগ করে থাকবেন ।

নবম অধ্যায় : কামিল কীভাবে জানতে পেরেছিল যে শেষ নবী (সা।)ইন্তেকালের পরে উপরের জগতে কী ঘটতে চলেছে।

অতঃপর কামিল গভীর চিন্তা ও আকাশের গ্রহরাজির চলাচল ও সূর্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করল এবং দেখল যে সূর্য, চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রতিদিনের চলাচলের পাশাপাশি উত্তর – দক্ষিণে হেলানো তাদের গতিপথ। দৈনিক পূর্ব-পশ্চিম গতিপথ অবশ্যই সর্বোচ্চ গোলকের উপর পরিচালিত হতে হবে, যা খুব দ্রুত গতিবিধির এবং এটি নীচের সমস্ত গোলককে অন্তর্ভুক্ত করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মেরুগুলি অভিন্ন হতে পারে না, এতে সর্বোচ্চ গোলকের গতি নিম্নতর গোলকের মধ্যে সঞ্চারিত হবে না।

তারপরে সে পর্যবেক্ষণ করল যে সূর্যের পার্শ্ব হেলান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, যতক্ষণ না এটি শূন্য হয়। সূর্যটি সবচেয়ে বড় বৃত্তে চলেছে, যখন তা বিশ্ব রেখায় না আসে। এর বিভিন্ন পরিণতি রয়েছে: (১) চাঁদের অক্ষাংশ স্থির থাকায় সূর্য থেকে চাঁদের পার্শ্বীয় বিচ্যুতি অবশ্যই আরও বেশি হতে হবে; (২) দ্বিতীয় গোলকের মেরুগুলি সর্বোচ্চটির নীচে, অবশ্যই সর্বোচ্চ গোলকের সাথে মিলিত হতে হবে। এবং সর্বোচ্চ গোলকের গতিপথ আর সর্বনিম্ন গোলকের মধ্যে সঞ্চারিত হবে না, সুতরাং গ্রহগুলির গতিবিধি (সূর্য ও চাঁদ সহ) পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে স্পষ্ট হবে। অতএব সূর্য একদিন পশ্চিম দিকে উঠতে বাধ্য। (৩) দিন এবং রাত সকল দেশে সমান দৈর্ঘ্যের হতে হবে; পশ্চিমে কেবল সূর্য উদয়ের আগের রাতটি দীর্ঘতর হবে (৪) ঋতুর মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না, এবং নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে দূরের অঞ্চলগুলি অত্যন্ত শীতল হয়ে উঠবে এবং এর কাছাকাছি অঞ্চলগুলি তীব্র গরম হবে। এটি জলবায়ুকে অনুপযুক্ত করে তুলবে মানব মেজাজের জন্য। । মানুষের চরিত্রগুলি পরিবর্তিত হবে, পৃথিবীর প্রকট হয়ে উঠবে এবং অপরাধ ও ঝামেলা প্রচলিত হয়ে উঠবে।

দশম অধ্যায় : কামিল কিভাবে জানতে পারলেন শেষ নবী (সা) - এর ইন্তেকালের পরে নীচের বিশ্বে কী ঘটবে?

কামিল চিন্তা করল, সূর্যের পার্শ্বীয় বিচ্যুতি ক্রমাগত কমে যাওয়ার ফলস্বরূপ, এটা বিশ্ব রেখার চূড়াতে থাকবে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের কাছাকাছি দেশগুলি খুব উত্তপ্ত অঞ্চল হবে এবং উল্লেখযোগ্য আক্ষাংশে প্রচন্ড ঠান্ডা থাকবে সুতরাং ভারসাম্য থেকে স্থানগুলি ভারসাম্যহীন হয় যাবে। সুতরাং অধিকাংশ দেশের মানুষের মেজাজ পরিবর্তন হয়ে মন্দ ও খারাপ হয়ে যাবে, তাদের অন্তর দুর্বল হয়ে যাবে এবং পুরুষদের মেজাজের পার্থক্যের কারণে তারা প্রায়শই হঠাৎ মারা যাবে। সুতরাং তাদের চরিত্র এবং সম্পর্ক খুব খারাপ হবে। খারাপ কাজ, মামলা চলতে থাকবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তাদের চরিত্র ভিন্ন হবে, আলাদা হবে। এর ফলে বহু যুদ্ধ, ঝামেলা এবং বহু যুদ্ধের ফলে বহু রক্তপাত হবে। খারাপ লোকেরা সামনে ও ভাল লোকেরা পিছনে থাকবে। যেহেতু কোন খারাপ মেজাজ খারাপ মেধা তৈরি করবে, এতে খারাপ মেধার লোকজন খারাপ হবে ও বুদ্ধিমত্তার, প্রজ্ঞা অনুসরণ করবে না। বিজ্ঞান তখন কম দেখা যাবে।

যখন পার্শ্বীয় বিচ্যুতি একবারে শূন্য হবে, বিশ্বরেখার নিকটে খুব গরম হবে। এবং অনেক অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হবে বিশেষতঃ যে সমস্ত দেশ গরুরময় ও গন্ধক বেশী পাওয়া যায়। তারপরে ইয়েমেনে আগুন শুরু হবে এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে। প্রচুর ধোঁয়াশা থাকবে এবং

অস্বাস্থ্যকর বাতাস, বজ্রঝড় এবং ভয়ঙ্কর বজ্র উৎপন্ন হবে এবং বাতাসে অনেক ভীতিকর লক্ষণ থাকবে। প্রচুর ধোঁয়াশার কারণে বায়ু আর্দ্র এবং অস্বচ্ছ হয়ে উঠবে এবং এর ফলস্বরূপ মাটি তার অনেকগুলি অংশ এবং জলীয় অংশ হারাতে এবং এর পদার্থ অংশ খুব হ্রাস পাবে, যাতে মেরুগুলির কাছে অঞ্চলে মাটিগুলি তুলনায় খুব ভারী হয়ে উঠবে। অতএব পৃথিবীর পৃষ্ঠের বড় অংশগুলি ভেঙ্গে যাবে, পর্বতগুলি ধসে পড়বে এবং সমতল আকার ধারণ করবে। পানি খুব দুর্লভ হয়ে উঠবে, কারণ সেখানকার উত্থানের কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিকটে প্রবাহিত হবে এবং এর দ্বারা বাষ্প হয়ে যাবে তাপ শক্তিতে। ফলস্বরূপ অনেক গাছ শুকনো হয়ে যাবে। মাটি আরও হ্রাস পাবে কারণ এর একটি বড় অংশ বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাবে। সুতরাং পৃথিবীর গুপ্তধনগুলি প্রকট হয়ে উঠবে।

যখন সূর্যের পার্শ্ব বিচ্যুতির কিছু সময়ের জন্য অব্যাহত থাকবে, তখন ভারসাম্য থেকে বিচ্যুতি অত্যধিক হয়ে উঠবে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের মেজাজ বেশী খারাপ হয়ে যাবে। তারপরে শেষ দিন আসবে। তার আগে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে বাতাস এবং ধোঁয়ার কারণে অনেক ভূমিকম্প এবং ভূমি হ্রাস হতে থাকতে। খুব উত্তপ্ত অঞ্চলে এটি হবে কারণ তাপ মাটি অংশগুলিকে উপরের দিকে এবং খুব শীতল অঞ্চলে নিয়ে যাবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠটি ঘন এবং অত্যধিক শক্ত হয়ে যাবে। ফলে ধোঁয়া এবং বাতাস কোনও উপায় খুঁজে পাবে না।

পুরুষের মেজাজের পার্থক্যের কারণে তাদের চেহারাও আলাদা হবে এবং তাদের চেহারাও কুৎসিত হবে সুতরাং সেখানে সম্ভবত এমন কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারে যা তার সঙ্গীদের সাথে কথা বলতে সক্ষম। তাদের মধ্যে পশুর বাহ্যিক উপস্থিতি থাকবে। ' বহু যুদ্ধের কারণে অনেক পুরুষকে হত্যা করা হবে, এবং মহিলারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। সুতরাং তারা লম্পট এবং জঘন্য হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের সন্তুষ্ট করার মত পর্যাপ্ত পুরুষ খুঁজে পাবে না, এবং সেখানে অনেক স্ত্রী সমকামিতা উদ্ভব হবে। উত্তপ্ত অঞ্চলগুলিতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে পদার্থের পরিমাণ হ্রাস হওয়ার কারণে ফল ও ফসল খুব দুঃপ্রাপ্য হয়ে উঠবে। কারণ পাকা করার জন্য যে ঠান্ডা প্রয়োজন সেটির অভাব হবে। ঠান্ডা অঞ্চলে যে তাপ পদার্থকে আকর্ষণ ও ফল পাকানোয় প্রয়োজন তার অভাব হবে।

ভারসাম্যপূর্ণ জলবায়ুর অঞ্চলগুলি কম হবে। ফল ও ফসলও কম হবে। এই কারণে খরা ও অভাবের সময় অনেক চুরি, ডাকাতি, ইত্যাদি বেড়ে যাবে।

যখন প্লেস্টোসিন সম্পূর্ণ শেষ হবে, প্রথম জলবায়ু ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রচলিত উত্তপ্ত হবে। সপ্তম জলবায়ু ও এর নিকট এলাকা খুবই ঠান্ডা হবে। এবং উভয় এলাকা বসবাসের উপযোগী থাকবে না।

সুতরাং এই দুটি জলবায়ুর বাসিন্দারা হিজরত করতে বাধ্য হবে। প্রথম জলবায়ুর, যারা সুদানের তারা দক্ষিণে ও উত্তরে। যারা সপ্তম জলবায়ুর, তুর্কি, তাতার, রাশিয়ান এবং (উপজাতি) ইয়াজুজ এবং মাজুজ, তাদের রাজা, সেনাবাহিনী ও সওয়ারী সহ দক্ষিণ দিকে হিজরত করবে।

সুতরাং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত কাছাকাছি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলির বাসিন্দারা লড়াই করবে এই দুই দলের সাথে এবং তাদের অত্যাচারের চেপ্টা করবে। তবে তারা সেই অঞ্চলগুলিকে কিছুটা জয় করবে। সেখানেও দাম বাড়বে এবং ভাগ্য সংকীর্ণ হয়ে উঠবে যেমনটি হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক মানুষ যখন অতিরিক্ত হয়।

সূর্যের পার্শ্ব বিচ্যুতি শূন্য হওয়ার পর, আবার একটা 'বিচ্যুতি' অবশ্যই আসতে হবে যতই নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলি তাদের ধীর গতি অব্যাহত রাখবে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। যখন এ গতি অনুভব যোগ্য হবে, পৃথিবী তার প্রথম স্তরে ফিরে আসবে।

পরিবেশের শর্ত এবং বায়ু আবার প্রাণীদের জীবনের জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তা ধূলিকণার সাথে মিশ্রিত হবে এবং তা সূর্যের তাপে গাঁজন (fermentation) তৈরী করবে। আর এই মিশ্রণ মানব দেহ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহ গঠনের ভিত্তি হতে

সক্ষম হবে। তারপরে আল্লা সেই অবিদ্যমানী ‘মেরুদণ্ডের ছোট্ট অংশটিকে (নিউক্লিয়াস)’, যা মানুষের আল্লার সাথে যুক্ত, উদ্বিগ্ন করতে সক্ষম হবে। আর এই মাটিও অতীব সূক্ষ্ম পদার্থের উত্তম উপকরণ হবে, এবং এর থেকে সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ মানব সৃষ্ট হতে পারবে ও পূর্ণবাসিত হবে যেমন তারা পূর্বে ছিল। এটা হল মৃতদের পুনরুত্থান (ressurrection)। (এ ভাবে কামিল যুক্তির কষ্টপাথরে সত্য সমাজের সংস্পর্শে এসে মানবজাতির ও বিশ্ব জগতের অবস্থা উপলব্ধি করল)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সর্ব শক্তিমান ও সবকিছু ভাল জানেন।

এখানে আমরা বইটি শেষ করলাম, শুধু মাত্র মহান আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ও তাঁর প্রেরিত রাসূলের উপর দরুদ ও ছালাম জানিয়ে।

.....